অমিয় বাণী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীসারদাদেবী ও
তাঁহাদের ষোলজন সন্ন্যাসী-
সন্তানের বাণীসঞ্চয়ন

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়
সংকলিত

ভূমিকা

'অমিয় বাণী' অমৃতের খনি, কারণ এই একখানি বইয়ে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও তাঁর সকল সন্ন্যাসী-সন্তানের (সংখ্যায় মোট ১৬ জন) অমৃতময়ী বাণীর একত্র সমাবেশ। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী পৃথকভাবে পাওয়া যায় বলে তাঁর বাণী বেশী দেওয়া হয়নি। অপর ১৫ জনের বাণীর প্রচার বেশী না থাকায় ঐগুলির সার বহু স্থান হতে সংগ্রহ করে একত্র গ্রথিত করে দেওয়া হল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হতে হলে তাঁর সন্ন্যাসী-সন্তানগণের উক্তিগুলির অনুশীলন অপরিহার্য। 'অমিয় বাণী' এই রকম একখানি বই যাতে শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেমানন্দ, শিবানন্দ, অদ্ভুতানন্দ, অভেদানন্দ, তুরীয়ানন্দ, সারদানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ, বিজ্ঞানানন্দ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি সকলের উপদেশবাণীর সার একসঙ্গে পাওয়া যাবে। পাঠকগণ 'অমিয় বাণী' পাঠে উপকৃত হলে শ্রম সফল জ্ঞান করব।

এই উপলক্ষে আমি যাবতীয় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের রচয়িতা ও প্রকাশকগণের গ্রন্থ হতে উপাদান সংগ্রহ করেছি বলে অশেষ ধন্যবাদের সঙ্গে তাঁদের নিকট আমার অপরিশোধ্য ঋণ স্বীকার করছি।

'শিবানন্দ ভবন'
দমদম
কলিকাতা—৩০

বিনীত
শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীসারদা দেবী
ব্রহ্মানন্দ প্রেমানন্দ যোগানন্দ নিরঞ্জনানন্দ
রামকৃষ্ণানন্দ সারদানন্দ অদ্ভুতানন্দ শিবানন্দ
অভেদানন্দ অদ্বৈতানন্দ তুরীয়ানন্দ অখণ্ডানন্দ
ত্রিগুণাতীতানন্দ সুবোধানন্দ বিজ্ঞানানন্দ

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা

শ্রীমুখ-কথিত স্বরূপ

১। যে রাম, যে কৃষ্ণ, সে-ই এ আধারে রামকৃষ্ণ।

২। যে বৃন্দাবনে গোপগোপিনী নিয়ে রাসলীলা করেছিল, সে-ই এই শরীরটাতে আছে।

৩। নদের গৌরাঙ্গই আমি। আমিই অদ্বৈত-চৈতন্য-নিত্যানন্দ—একধারে তিন।

৪। দেখলাম, খোলটি ছেড়ে সচ্চিদানন্দ বাইরে এল, এসে বললে, 'আমি যুগে যুগে অবতার।' তখন ভাবলাম—বুঝি মনের খেয়ালে ঐসব কথা বলছি। তারপর চুপ করে থেকে দেখলাম, তখন দেখি আপনি বলছে, 'শক্তির আরাধনা চৈতন্যও করেছিল।'

৫। দেখলাম পূর্ণ আবির্ভাব, তবে সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য।

৬। দেখছি, এর ভেতর থেকে যা কিছু। সব দেবদেবীর মূর্তি দেখলাম, তার মধ্যে এটাকেও দেখলাম।

৭। এর ভেতর মা স্বয়ং ভক্ত নিয়ে লীলা করছেন। এ মুখ দিয়ে মা কথা কন। এর একটাও মিথ্যে হবার যো নেই। একটা মিথ্যে হলে যে সবই মিথ্যে হবে।

৮। এর ভেতর কে আছেন, আমার বাপেরা জানতেন। বাপ গয়াতে স্বপ্ন দেখেছিলেন—রঘুবীর বলছেন, 'আমি তোমার ছেলে হব।' এ দেহটি গয়া হতে এসেছে।

৯। পুরীর জগন্নাথ ও আমি এক।

১০। যখন প্রথম এই অবস্থা হল, তখন জ্যোতিতে দেহ জ্বল্‌জ্বল্‌ করত, বুক লাল হয়ে যেত। তখন বললুম, 'মা, বাইরে প্রকাশ হোয়ো না, ঢুকে যাও, ঢুকে যাও।' তাই এখন এই হীন দেহ। তা না হলে লোকের ভিড় লেগে যেত। এতে আগাছা পালায়। যারা শুদ্ধ ভক্ত, তারাই কেবল থাকবে।

১১। আমি পূর্ণ, আর আমার ছেলেরা অংশ। আমাকে ধ্যান করলেই হবে। এই মূর্তিই (তাঁর বসা সমাধিস্থ মূর্তি) ধ্যান করবে। আর কিছু করতে হবে না, আমার চিন্তা কর।

১২। এর ভেতর ঈশ্বরের সত্তা রয়েছে। আমি আর কি? তিনি। এর ভেতর তিনিই আছেন।

১৩। আমাকে যে ঈশ্বরবুদ্ধি করবে, সে পূর্ণ জ্ঞানী।

১৪। আমার চিন্তা যে করে, সে কখনও খাওয়ার কষ্ট পায় না।

১৫। যে আমাকে যত বুঝবে, সে তত এগিয়ে যাবে।

১৬। এখানকার অবস্থা বেদবেদান্তে যা লেখা আছে, সে সকলকে ছাড়িয়ে গেছে।

১৭। তিনি ভক্তের জন্যে যখন দেহ ধারণ করে আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে ভক্তরাও আসে। কেউ অন্তরঙ্গ, কেউ বহিরঙ্গ, কেউ রসদদার। দেখালে পাঁচ জন সেবায়েত। যারা আত্মীয়, তারা কেউ অংশ, কেউ কলা।

১৮। সব মন কুড়িয়ে যদি আমাতে এলো, তা হলে তো সবই হলো। যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ—বাক্য মনের অতীত, তিনিই এই শরীরে এসেছেন।

১৯। আমি ঈশ্বর, জগতের কল্যাণের জন্যে এসেছি। আমার কথা শোন, চির শান্তি লাভ করবে।

২০। এবার আসা, যেমন রাজা ছদ্মবেশে রাজ্য দেখতে আসে—জানাজানি হলেই সরে পড়ে।

২১। বাউলের দল এলো, গেল, কেউ চিনলে না।

২২। (শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে)—ও সারদা, সরস্বতী; জ্ঞান দিতে এসেছে।

২৩। যিনি রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, ক্রাইস্ট, চৈতন্য—ইদানীং তিনিই রামকৃষ্ণ।

২৪। এর পর ঘর ঘর আমার পূজা হবে।

২৫। এবার স্বয়ং মহামায়া নবরূপে বেড়াতে এসেছেন।

২৬। আমার চিন্তা যে করবে, সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে—যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে। আমার ঐশ্বর্য—জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, প্রেম, সমাধি।

অবতার ও গুরু

১। অবতারকে দেখাও যা, ঈশ্বরকে দেখাও তা।

২। তিনি যখন নিজে মানুষ হয়ে আসেন, অবতার হন, জীবের মুক্তির চাবি তাঁর হাতে থাকে।

৩। তিনি যখন মানুষ হয়ে অবতীর্ণ হন, তখন ধ্যানের খুব সুবিধে।

৪। এই মানুষের ভেতর মানুষ রতন আছে। মানুষের

ভেতর নারায়ণ, দেহটি আবরণ। যেন লণ্ঠনের ভেতর আলো জ্বলছে, অথবা সার্সির ভেতর বহুমূল্য জিনিস দেখছি।

৫। পঞ্চভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।

৬। তিনি অবতার হয়ে থাকেন, এটি উপমা দিয়ে বুঝান যায় না। অনুভব হওয়া চাই, প্রত্যক্ষ হওয়া চাই।

৭। মানুষে তিনি অবতীর্ণ হন—যেমন শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র, চৈতন্যদেব। ঐ চোদ্দ-পোয়া মানুষের ভেতর জগন্মাতা প্রকাশ হন।

৮। অবতারকে সকলে চিনতে পারে না, চিনতে গেলেই সাধনের প্রয়োজন। দেহ ধারণ করলে রোগ-শোক-ক্ষুধা-তৃষ্ণা সবই আছে। মনে হয় আমাদেরই মত। রামচন্দ্রকে বার জন ঋষি চিনতে পেরেছিল।

৯। মন থেকে কামিনী-কাঞ্চন সব না গেলে অবতারকে চিনতে পারা কঠিন। বেগুনওয়ালা হীরের মূল্য কি জানে? (বেগুনওয়ালা ও হীরার গল্প)।

১০। পুকুরের জলে চাঁদের আলো দেখে মাছেরা মনে করে, চাঁদ আমাদের কাছে আছেন। সেইরকম অবতার যখন আসেন, লোকে মনে করে, আমাদের মতন একজন মানুষ।

১১। অবতারের ওপর ভালবাসা এলেই হল। অবতার—যিনি তারণ করেন। অবতারের মুখ দিয়ে তিনি নিজে কথা কন।

১২। অবতারাদি ঈশ্বরকোটি, মহাকারণে গিয়ে ফিরে আসতে পারে। ঈশ্বরকোটি না হলে সমাধির পর ফেরে না।

১৩। অবতারাদির লোকশিক্ষার জন্যে ব্রহ্মজ্ঞানের পরও শরীর থাকে। ব্রহ্মজ্ঞানের পর তাঁরা ভক্তি নিয়ে থাকেন।

১৪। অবতারাদি লোকশিক্ষার জন্যে ভক্তি ভক্ত নিয়ে থাকেন—যেমন, ছাদে উঠে সিঁড়িতে আনাগোনা করা।

১৫। ঈশ্বর খুঁজতে হলে অবতারের ভেতর খুঁজতে হয়।

১৬। অবতারের ভেতর তাঁর শক্তি বেশী প্রকাশ, সেই শক্তি কখন কখন পূর্ণভাবে থাকে। গঙ্গায় গঙ্গাজল স্পর্শ করে লোকে বলে—গঙ্গা দর্শন ও স্পর্শ করে এলুম, হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত হাত দিয়ে ছুঁতে হয় না। তাঁর অবতারকে দেখলেই তাঁকে দেখা হল। অবতার যেন গাভীর বাঁট।

১৭। মনুষ্যলীলা কেন জান? এর ভেতর তাঁর কথা শুনতে পাওয়া যায়, এর ভেতর তাঁর বিলাস, এর ভেতর তিনি রসাস্বাদন করেন। আর সব ভক্তদের ভেতর তারই একটু একটু প্রকাশ, যেমন ফুল চুষতে চুষতে একটু মধু।

১৮। কখন কখন আকাশে সূর্য অস্ত না যেতে যেতে চন্দ্রোদয় হয়। অবতারাদির ভক্তিচন্দ্র ও জ্ঞানসূর্য একাধারে দেখা যায়।

১৯। যে মানুষে দেখবে ঊর্জিতা ভক্তি, ভাবে হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়—সেখানে আমি আছি।

২০। বেদান্ত-মতে অবতার নেই। সে-মতে চৈতন্যদেব অদ্বৈতের একটি ফুট। রাম, কৃষ্ণ—এঁরা সচ্চিদানন্দ-সাগরের দুটি ঢেউ। (শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন প্রসঙ্গ—থোলো থোলো কাল জাম)।

২১। ভক্তিমতে অবতার। চৈতন্যদেব অবতার, ঈশ্বর

অবতীর্ণ। তাঁ'তে ব্রহ্মজ্ঞান ও ভক্তিপ্রেম দুই-ই ছিল। হাতীর যেমন ভেতরের দাঁত ও বাইরের দাঁত, তাঁর তেমনি ভেতরে অদ্বৈত জ্ঞান, বাইরে ভক্তি। বেদান্ত ও শক্তি-উপাসনা তাঁর ভেতরের ভাব।

২২। চৈতন্যদেবের জ্ঞান সৌর জ্ঞান, জ্ঞানসূর্যের আলো। আবার তাঁর ভেতর ভক্তি-চন্দ্রের শীতল আলোও ছিল। সংসারীর জ্ঞান আর সর্বত্যাগীর জ্ঞান, অনেক তফাৎ—যেমন দীপের আলো আর সূর্যের আলো।

২৩। চৈতন্যদেবের তিনটি অবস্থা—(১) বাহ্যদশা—তখন স্থূল ও সূক্ষ্মে মন থাকত। (২) অর্ধ-বাহ্যদশা—তখন কারণশরীরে, আনন্দময় কোষে, কারণানন্দে মন গিয়েছে। (৩) অন্তর্দশা—তখন মহাকারণে মন লয় হত। বেদান্তের পঞ্চকোষের সঙ্গে এর বেশ মিল আছে। স্থূলশরীর, অর্থাৎ অন্নময় ও প্রাণময় কোষ। সূক্ষ্মশরীর, অর্থাৎ মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ। কারণশরীর, অর্থাৎ আনন্দময় কোষ। মহাকারণ পঞ্চকোষের অতীত। মহাকারণে যখন মন লীন হত, তখন সমাধিস্থ—এরই নাম নির্বিকল্প বা জড়সমাধি। চৈতন্যদেব বাহ্যদশায় নাম-সঙ্কীর্তন করতেন। অর্ধ-বাহ্যদশায় ভক্তসঙ্গে নৃত্য করতেন। অন্তর্দশায় সমাধিস্থ হতেন। তিনি ভক্তি শেখাতে এসেছিলেন, ভক্তির অবতার।

২৪। শঙ্করাচার্য, রামানুজ—এঁরা সব 'বিদ্যার আমি', 'ভক্তির আমি' নিয়ে ছিলেন। সমাধির পর অবতারাদির 'আমি' আবার ফিরে আসে।

২৫। বুদ্ধদেব দশ অবতারের এক অবতার। বুদ্ধি যখন অচল, অটল বোধস্বরূপ ব্রহ্মে লয় হয়, তখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়; তখন মানুষ বুদ্ধ হয়ে যায়। মনের লয় বুদ্ধিতে, বুদ্ধির লয় বোধস্বরূপে (ব্রহ্মে)।

২৬। সেই একই অবতার। যেন ডুব দিয়ে এখেনে উঠে কৃষ্ণ হলেন, আর ওখানে যিশু হলেন। এখন বলে দিচ্ছেন, তুমি দেহ ধারণ করেছ; সাকার নররূপ নিয়ে আনন্দ কর।

২৭। অবতার-লীলা সেই আদ্যাশক্তিরই খেলা। শক্তিরই অবতার।

২৮। তিনি সর্বস্থানে সর্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু অবতার না হলে জীবের আকাঙ্ক্ষা পোরে না। প্রয়োজন মেটে না। ঈশ্বরই যুগে যুগে মানুষরূপে অবতীর্ণ হন।

২৯। অবতার, সিদ্ধপুরুষ ও জীবে শক্তি নিয়েই প্রভেদ।

৩০। সন্ন্যাসী জগৎ-গুরু।

৩১। মানুষ-গুরু মন্ত্র দেয় কানে, আর জগৎ-গুরু মন্ত্র দেয় প্রাণে। লোকশিক্ষা দেবে, তার চাপরাশ চাই।

৩২। সচ্চিদানন্দই গুরুরূপে আসেন। গুরু এক সচ্চিদানন্দ।

৩৩। গুরুকে ঈশ্বর জ্ঞান করলে তবে হয়। তাই বৈষ্ণব-শাস্ত্র বলে—গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব। গুরু কর্ণধার।

৩৪। যিনি ইষ্ট, তিনি গুরুরূপে আসেন। তিনিই গুরু, তিনিই ইষ্ট।

৩৫। পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব। গুরু জীবের

অষ্টপাশ খুলে দেন। গুরুই সব করেন, তবে শেষটা একটু সাধনা করিয়ে নেন। (বড় গাছ কাটার কথা)।

৩৬। কাঁচা গুরুর পাল্লায় পড়লে শিষ্য মুক্ত হয় না। গুরু কাঁচা হলে গুরুরও যন্ত্রণা, শিষ্যেরও যন্ত্রণা। যদি সদ্‌গুরু হয়, জীবের অহঙ্কার তিন ডাকে ঘোচে।

৩৭। গুরুর কৃপা হলে কিছু ভয় নেই। গুরু জানিয়ে দেবেন—তুমি কি, তোমার স্বরূপ কি। কৃপা হলে হাজার বছরের অন্ধকার এক মুহূর্তে দূর হয়। সদ্‌গুরু লাভ হলেই জীবের উদ্ধার (ছাগলের পালে বাঘ পড়ার গল্প)।

৩৮। গুরুর কৃপাবলে এক মুহূর্তে সব গেরো খুলে যায়। গুরু মেহেরবান, তো চেলা পালোয়ান।

৩৯। গুরু হয়ে গেল তো তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসতে পাওয়া গেল।

৪০। গুরু এসে ইষ্ট দেখিয়ে বলেন, 'ঐ তোমার ইষ্ট'। তারপর গুরু ইষ্টে লয় হয়ে যান। গুরুই হল সব, গুরুর চেয়ে বড় আর কিছু নেই।

৪১। গুরুর হাতে কাঠি, তিনি খুলে দিলে তবে চৈতন্যভাণ্ডারের দ্বার খোলে, নচেৎ নয়।

৪২। গুরুরূপ হয়ে ঈশ্বর যদি স্বয়ং মায়াপাশ ছেদন করেন, তা হলে আর ভয় নেই। গুরু যদি ভার নেন তো ভাবনা কি ?

৪৩। যার গুরুপদে আছে মন।
তার হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন ॥

৪৪। গুরুর কৃপায় জ্ঞানলাভের পরেও সংসারে জীবন্মুক্ত হয়ে থাকা যায়।

নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্ম

১। বেদান্তদর্শনের বিচারে ব্রহ্ম নির্গুণ, তাঁর কি স্বরূপ—মুখে বলা যায় না। কিন্তু তুমি নিজে যতক্ষণ সত্য, ততক্ষণ জগৎও সত্য, ঈশ্বরের নানা রূপও সত্য, ঈশ্বরকে ব্যক্তিবোধও সত্য।

২। ব্রহ্ম কি জিনিস মুখে বলা যায় না। সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়েছে, কিনা মুখে বলা হয়েছে, কেবল ব্রহ্মই উচ্ছিষ্ট হয় নাই।

৩। ব্রহ্মের স্বরূপ মুখে বলা যায় না, চুপ হয়ে যায়। অনন্তকে কে মুখে বোঝাবে? পাখী যত ওপরে ওঠে, তার ওপর আরো আছে। লবণ-পুত্তলিকা সাগর মাপতে গিছিলো, ফিরে এসে আর খবর দিলে না। একমতে আছে, শুকদেবাদি দর্শন, স্পর্শন করেছিল, ডুব দেয় নাই। শিব তিন গণ্ডূষ পান করে অজ্ঞান হয়েছিল।

৪। যখন তিনি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেন, তখন তাঁকে সগুণব্রহ্ম—আদ্যাশক্তি বলি। যখন তিনি তিনগুণের অতীত, তখন তাঁকে বাক্যমনের অতীত নির্গুণব্রহ্ম বলি।

৫। ক্ষর অক্ষরের পারে কি আছে, মুখে বলা যায় না।

৬। যিনিই সগুণ, তিনিই নির্গুণ। যাঁরই নিত্য, তাঁরই

লীলা। নিত্য থেকেই লীলা—এক থেকেই অনেক। লীলা ওপরে ফৎ ফৎ করছে, নিত্য ধীর স্থির গম্ভীর।

৭। যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। দূর থেকে সমুদ্র নীলবর্ণ দেখায় ; কাছে যাও, কোন্ রং নেই।

৮। ভক্তের জন্যে তিনি সগুণ হয়ে, একজন ব্যক্তি হয়ে, রূপ হয়ে দেখা দেন। তিনিই প্রার্থনা শোনেন।

৯। তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন। ব্রহ্ম অলেপ। তিন গুণ তাঁ'তে আছে, কিন্তু তিনি নির্লিপ্ত। যেমন বায়ুতে সুগন্ধ, দুর্গন্ধ দুই-ই আছে, কিন্তু বায়ু নির্লিপ্ত।

১০। আগুনে যদি নীল বড়ি ফেলে দাও, নীল শিখা দেখা যায়, রাঙ্গা বড়ি ফেলে দাও, লাল শিখা দেখা যায় ; কিন্তু আগুনের কোন রং নেই। জলে নীল রং ফেলে দাও, নীল রং হবে, আবার ফট্‌কিরি ফেলে দিলে সেই জলেরই রং। যেখানে ঠিক ঠিক, গুণ সেখেনে পৌঁছুতে পারে না।

১১। বেদে আছে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম একও নয়, দুইও নয় ; এক-দু'য়ের মধ্যে। অস্তিও বলা যায় না, নাস্তিও বলা যায় না ; তবে অস্তি-নাস্তির মধ্যের অবস্থা। যেখানে ঠিক ঠিক, সেখেনে অস্তি নাস্তি ছাড়া। এ অস্তি নাস্তি প্রকৃতির গুণ।

ব্রহ্ম কার্যকারণের পার, বিদ্যা অবিদ্যার পার ; তিনি মায়াতীত।

১২। একটা সমুদ্রের কথা ভাব। সব জলে জল, আর মানুষগুলো জলপূর্ণ কলসী, ঐ সাগরে ভাসছে। কোন রকমে

কলসী ভেঙ্গে গেল। তখন কলসীর জল আর সাগরের জল এক হয়ে গেল। সব সাগর—সচ্চিদানন্দ সাগর। এই ব্রহ্ম।

১৩। কার্য থাকলেই তার পেছনে কারণ আছে। শক্তি থাকলেই তার পেছনে শক্তিমান আধার আছে।

১৪। সচ্চিদানন্দ যে কি, তা কেউ বলতে পারে না। তাই তিনি প্রথমে হলেন অর্ধনারীশ্বর, কেন না, দেখাবেন বলে যে, পুরুষ প্রকৃতি দুই-ই আমি। তারপর তা থেকে আরো এক থাক নেমে আলাদা আলাদা পুরুষ ও আলাদা আলাদা প্রকৃতি হলেন।

১৫। চিনির পাহাড়ের কাছে এক পিঁপড়ে গিছিল। তার সব পাহাড়টার কি দরকার? একটা দুটো দানা হলেই হেউ-ঢেউ হয়ে যায়। ব্রহ্মকে কে জানতে পারে? বুদ্ধি দিয়ে কি তাঁকে বোঝা যায়? এক সের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে?

১৬। ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু।

১৭। যিনি পরমাত্মা, তিনি জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—তিন অবস্থারই সাক্ষিস্বরূপ। স্বপ্নও যত সত্য, জাগরণও তত সত্য। (চাষা ও তার ছেলে হারুর গল্প)।

১৮। নেতি নেতি করে যা বাকী থাকে ও যেখানে আনন্দ, সেই ব্রহ্ম।

১৯। বিচার দুই প্রকার—অনুলোম, বিলোম। ঘোলেরই মাখন, মাখনেরই ঘোল। আত্মা যদি আছে, তো অনাত্মাও আছে। খোলা (জগৎ), বীচি (জীবগুলি) বাদ দিলে বেলের (ব্রহ্মের) ওজন কম পড়ে।

২০। যিনি ব্রহ্ম, তাঁর সত্তাতেই জীবজগৎ। যতক্ষণ মনের দ্বারা বিচার, ততক্ষণ নিত্যেতে পৌঁছান যায় না। মনের দ্বারা বিচার করতে গেলেই জগৎকে ছাড়বার যো নেই। বিচার বন্ধ হলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান।

২১। ব্রহ্ম যেন সমুদ্র, জলে জল। কুম্ভের ভেতর বাইরে জল, তবু কুম্ভ তো আছে। ঐটি ভক্তের 'আমি'র স্বরূপ। কুম্ভ না থাকলে, তখন সে এক কথা। যতক্ষণ ভক্তের 'আমি' রেখে দিয়েছেন, ততক্ষণ লীলাও সত্য।

শক্তিতত্ত্ব

১। যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আদ্যাশক্তি। প্রতিবিম্ব সগুণ-ব্রহ্ম—আদ্যাশক্তি। ব্রহ্ম আর আদ্যাশক্তি প্রথম দুটো বোধ হয়, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হলে আর দুটো থাকে না, অভেদ—এক, যে একের দুই নেই—অদ্বৈতম্।

২। যতক্ষণ 'আমি'-জলে সূর্যকে দেখতে হয়, সূর্যকে দেখবার আর কোন উপায় নেই; আর যতক্ষণ প্রতিবিম্ব-সূর্য বই সত্য-সূর্যকে দেখবার উপায় নেই, ততক্ষণ প্রতিবিম্ব-সূর্যই ষোল আনা সত্য। যতক্ষণ 'আমি' সত্য, ততক্ষণ প্রতিবিম্ব সূর্যও সত্য, ষোল আনা সত্য। এই প্রতিবিম্ব-সূর্যই আদ্যাশক্তি।

৩। সকলেই সেই মহামায়া আদ্যাশক্তির অধীন। অবতার পর্যন্ত মায়া আশ্রয় করে লীলা করেন, তাই তাঁরা আদ্যাশক্তির পূজা করেন।

৪। বেদান্তবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলে—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, জীবজগৎ—এসব শক্তির খেলা, বিচার করতে গেলে এসব স্বপ্নবৎ। শক্তিও স্বপ্নবৎ অবস্তু, ব্রহ্মই বস্তু। কিন্তু হাজার বিচার কর, সমাধিস্থ না হলে শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে যাবার যো নেই। যতক্ষণ একটু 'আমি' থাকে, ততক্ষণ সেই আদ্যাশক্তির এলাকা—তাঁর 'অণ্ডারে' (under); তাঁকে ছাড়িয়ে যাবার যো নেই। সমাধিস্থ না হলে শক্তির লীলারাজ্য ছাড়িয়ে যাবার যো নেই।

৫। শক্তি মানতে হয়। ব্রহ্মও শক্তি, যেমন স্থির জল; আর জলে ঢেউ উঠেছে। সর্প আর তার তির্যগ্‌গতি। দুধও দুধের ধবলত্ব। জল আর তার হিমশক্তি। এই আদ্যাশক্তি, মহামায়া ব্রহ্মকে আবরণ করে রেখেছে। আবরণ গেলেই যা ছিলুম, তাই হলুম—আমিই তুমি, তুমিই আমি। সেই মহামায়া দ্বার ছেড়ে দিলে তবে অন্দরে যাওয়া যায়।

৬। বেদে যাঁকে ব্রহ্ম বলেছে, তাঁকেই আমি মা বলে ডাকছি।

৭। সেই চিৎশক্তি, সেই মহামায়া চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়ে রয়েছেন। তিনি চৈতন্যরূপে চরাচর বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন। তিনিই চৈতন্যস্বরূপ জগতের আধার, আধেয়—দুই-ই। সেই মহান্ ব্রহ্মযোনি থেকে এ জগৎ বেরুচ্ছে।

৮। মা-ই সব। তিনি অজ্ঞানরূপে বন্ধন, জ্ঞানরূপে মুক্তি। অবিদ্যারূপে ভ্রান্তি, বিদ্যারূপে বিবেক। মা আমার চিন্ময়ী ব্রহ্মশক্তি, ইচ্ছায় জগৎ প্রসব করেছেন। তিনি ইচ্ছা করলে

কি না করতে পারেন ? যিনি জগৎরূপে আছেন সর্বব্যাপী হয়ে, তিনিই মা।

৯। মা-ই সব। তিনি ত্রিগুণময়ী, আবার শুদ্ধসত্ত্বময়ী। তিনিই সকলের দেহে কুলকুণ্ডলিনীরূপে আছেন, যেন ঘুমন্ত সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে।

১০। তিনিই মহাকালী, নিত্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী। গৃহস্থবাড়িতে শ্যামাকালীর পূজা হয়। মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি হলে রক্ষাকালী-পূজা দিতে হয়।

১১। যখন সৃষ্টি হয় নাই, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, পৃথিবী ছিল না, তখন কেবল মা নিরাকারা মহাকালী মহাকালের সঙ্গে ছিলেন।

১২। তিনি সৎ, তাঁর আরেকটি নাম কাল (মহাকাল) ও একটি নাম ব্রহ্ম। কালী যিনি কালের সহিত রমন করেন। কাল ও কালী, ব্রহ্ম ও শক্তি।

১৩। কালী আর কেউ নয়, যিনিই ব্রহ্ম, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তিনিই কালী। ব্রহ্ম আর কালী অভেদ, যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি। অগ্নি ভাবলেই দাহিকাশক্তি ভাবতে হবে। ব্রহ্ম মানলেই কালী, আর কালী মানলেই ব্রহ্ম মানতে হয়।

১৪। দু'টি জিনিস-বই তো আর কিছু নেই—ব্রহ্ম আর শক্তি। জ্ঞান হলে ঐ দুটি এক বোধ হয়। নিত্যকে ছেড়ে শুধু লীলা বোঝা যায় না ; যেমন মণি না ভাবলে মণির জ্যোতি

ভাবতে পারা যায় না, মণির জ্যোতি ভাবলে মণি ভাবতে পারা যায় না।

১৫। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি—পুরুষ ও প্রকৃতি অভেদ। এ দুই স্বতন্ত্র বস্তু নয়, একই বস্তু। কখন পুরুষ, কখন প্রকৃতিভাবে। কখন সাপ স্থিরভাবে পড়ে আছে, কখন চলছে। যখন স্থির, তখন পুরুষ-ভাব; প্রকৃতি তার সঙ্গে মিশে আছে। ব্রহ্ম নিরুপম। যেমন আকাশের উপমা আকাশ, সাগরের উপমা সাগর, তেমনি ব্রহ্মের উপমা ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মই একরূপে নিত্য, একরূপে লীলা। মা একরূপে অনন্ত ভাবময়ী, একরূপে ভাবাতীতা।

১৬। যখন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, তখন গিন্নীর মত আদ্যাশক্তি সৃষ্টির বীজ কুড়িয়ে রাখেন। সৃষ্টির পর মা জগতের ভেতরই থাকেন। বেদের কথা—উর্ণনাভিবৎ। আদ্যাশক্তি অটলকে টলিয়ে দেন।

১৭। ভগবান ও তাঁর ঐশ্বর্য। ঐশ্বর্য দুদিনের জন্য। ভগবানই সত্য। বাজীকর আর তার বাজী। বাজী দেখে সব অবাক, কিন্তু সব মিথ্যা। বাজীকরই সত্য, বাজী মিথ্যে।

১৮। তিনি যতক্ষণ লীলার মধ্যে রেখেছেন, ততক্ষণ দুটো বলে বোধ হয়। কিন্তু আদ্যাশক্তি ও ব্রহ্ম অভেদ। ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তি হয় না, যেমন জলকে ছেড়ে তরঙ্গ হয় না, বাদ্যকে ছেড়ে বাজনা হয় না। শক্তি বললেই ব্রহ্ম আছেন, যেমন রাতবোধ থাকলেই দিনবোধ আছে। আর একটি অবস্থায় দেখলে ব্রহ্ম জ্ঞান-অজ্ঞানের পার, মুখে বলা যায় না।

যো হ্যায়, সো হ্যায়। যতক্ষণ অহংবুদ্ধি, ততক্ষণ লীলা ছাড়িয়ে যাবার যো নেই।

১৯। এক সচ্চিদানন্দ শক্তিভেদে উপাধিভেদ, তাই নানা রূপ। কিন্তু জল স্থির থাকলেও জল, তরঙ্গ ভুড়ভুড়ি হলেও জল।

২০। যা কিছু দেখছ, সবই পুরুষ-প্রকৃতির যোগ—যোগমায়া। শিব কালী। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, তাঁর যোগে প্রকৃতি কাজ করছেন—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন। রাধাকৃষ্ণ যুগল-মূর্তির মানেও ঐ। যোগমায়ার ভেতর তিন গুণই আছে—সত্ত্ব, রজ, তম।

২১। শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ, রাধা প্রকৃতি, চিচ্ছক্তি, আদ্যাশক্তি। এই চিচ্ছক্তি ও বেদান্তের ব্রহ্ম অভেদ। ভক্ত ঐ চিৎশক্তির এক একটি রূপ।

২২। রাধিকা বিশুদ্ধ সত্ত্বময়ী। সচ্চিদানন্দ নিজের রস আস্বাদন করবার জন্যে রাধিকার সৃষ্টি করেছেন। সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণই আধার, আর তিনি নিজেই শ্রীমতীরূপে আধেয়।

২৩। কালী কি কালো? দূরে—তাই কালো, জানতে পারলে কালো নয়। (সমুদ্রের জল উপমা)।

২৪। ওঁকারের উপমা ঘণ্টার 'টং' শব্দ—ট-অ-ম্-ম্। লীলা থেকে নিত্যে লয়। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ থেকে মহাকারণে লয়। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি থেকে তুরীয়ে লয়। আবার ঘণ্টা বাজলো, যেন মহাসমুদ্রে একটা গুরু জিনিস পড়লো, আর ঢেউ আরম্ভ হল। নিত্য থেকে লীলা আরম্ভ হল। মহাকারণ থেকে

কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর দেখা দিল। সেই তুরীয় থেকেই জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—সব অবস্থা এসে পড়ল। আবার মহা-সমুদ্রের ঢেউ মহাসমুদ্রেই লয় হল। নিত্য ধরে ধরে লীলা, আবার লীলা ধরে ধরে নিত্য। চিৎসমুদ্র অন্ত নেই, তাই থেকে এইসব লীলা উঠলো, আবার ঐতেই লয় হয়ে গেল। আমি ঠিক এই সব দেখেছি! আমায় দেখিয়ে দিয়েছে! তোমাদের বইএ কি আছে, অত আমি জানি নে।

২৫। তাঁর মহামায়াতে এই সংসার। এই মায়ার ভেতর বিদ্যামায়া, অবিদ্যামায়া—দুই আছে। বিদ্যামায়া আশ্রয় করলে সাধুসঙ্গ, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, বিবেক, বৈরাগ্য—এইসব হয়। অবিদ্যামায়া—পঞ্চভূত আর রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ—এরা ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়। কেন ঈশ্বরেতে মন যায় না? ঈশ্বরের চেয়ে তাঁর (মহামায়ার) আবার জোর বেশী।

২৬। তিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা—দুই-ই হয়ে রয়েছেন। অবিদ্যামায়ায় অজ্ঞান হয়ে রয়েছেন, বিদ্যামায়ার গুরুরূপে রোজা হয়ে ঝাড়ছেন।

২৭। তাঁর মায়াতে বিদ্যাও আছে, অবিদ্যাও আছে। অন্ধকারেরও প্রয়োজন আছে। অন্ধকার থাকলে আলোর আরো মহিমা প্রকাশ হয়। কাম ক্রোধ লোভ খারাপ জিনিস বটে, তবে তিনি দিয়েছেন কেন? মহৎ লোক তৈয়ের করবেন বলে। ইন্দ্রিয় জয় করলে মহৎ হয়। খোসাটি আছে বলে তবে আমটি বাড়ে ও পাকে। আমটি তৈয়ের হয়ে গেলে খোসা ফেলে দিতে হয়। মায়ারূপ ছালটি থাকলে তবেই ক্রমে

ব্রহ্মজ্ঞান হয়। বিদ্যামায়া-অবিদ্যামায়া আমের খোসার ন্যায় দুই-ই দরকার।

২৮। যতক্ষণ মায়ার ঘরের ভেতর আছ, যতক্ষণ মায়ামেঘ রয়েছে, ততক্ষণ জ্ঞানসূর্য কাজ করে না। মায়াঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ালে জ্ঞানসূর্য অবিদ্যা নাশ করে। ঘরের ভেতর আতস কাঁচে কাগজ পোড়ে না। ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালে রোদটি কাঁচে পড়ে। তখন কাগজ পুড়ে যায়। আবার মেঘ থাকলে আতস কাঁচে কাগজ পোড়ে না; মেঘটি সরে গেলে তবে হয়। কামিনী কাঞ্চনই মেঘ। কামিনী কাঞ্চনই মায়ার আবরণ।

২৯। তাঁর মায়াতে অনিত্যকে নিত্য বোধ হয়, আবার নিত্যকে অনিত্য বোধ হয়। সংসার অনিত্য—এই আছে, এই নেই; কিন্তু তাঁর মায়াতে বোধ হয়—এই ঠিক। তাঁর মায়াতেই 'আমি কর্তা' বোধ হয়; আর এইসব স্ত্রী-পুত্র বাড়ি-ঘর আমার। এই মায়া জীবজগৎ পার হয়ে গেলে, তবে নিত্যতে পৌঁছান যায়।

৩০। তাঁর সৃষ্টিও মায়া, তাঁর সংহারও মায়া।

৩১। মহামায়ার এমনি খেলা যে, যার তিন কুলে কেউ নেই, তাকে দিয়ে একটা বেড়াল পুষিয়ে সংসার করাবে।

৩২। মায়াকে যদি চিনতে পারো, লজ্জায় পালাবে।

৩৩। এই মায়া বা অহং যেন মেঘের স্বরূপ। সামান্য মেঘের জন্য সূর্যকে দেখা যায় না। মেঘ সরে গেলেই সূর্যকে দেখা যায়। যদি গুরুর কৃপায় একবার অহংবুদ্ধি যায়, তা হলে ঈশ্বর-দর্শন হয়।

৩৪। জীব তো সচ্চিদানন্দ স্বরূপ; কিন্তু এই মায়া বা অহঙ্কারে তাদের নানা উপাধি এসে পড়েছে। আর তারা নিজের স্বরূপ ভুলে গেছে। উপাধি যতই যাবে, ততই তিনি কাছে হবেন। ঈশ্বরের কৃপা হলে মায়া দ্বার ছেড়ে দেন, যেমন দারোয়ানরা বলে—বাবু, হুকুম দিন, ওকে দ্বার ছেড়ে দিচ্ছি।

৩৫। আত্মাই প্রকৃত সৎ বস্তু, ভগবানই আত্মস্বরূপ, আর সমস্তই মায়ার ভেল্কী। মায়া ভগবানের শক্তি। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তখন সকল শক্তি সংহার করে নিষ্ক্রিয় হতে পারেন। যখন নিষ্ক্রিয়, তখনও সকল শক্তি তাঁতেই পর্যবসিত থাকে। তিনি তাঁর মহাশক্তির দ্বারা এই পরিদৃশ্যমান জগৎলীলা করছেন।

৩৬। তিনি সব হয়েছেন বটে, কিন্তু কোনখানে বেশী শক্তির প্রকাশ, কোনখানে কম শক্তির প্রকাশ। সূর্যের কিরণ মাটিতে এক রকম পড়ে, আর্শীতে আর এক রকম পড়ে। তাঁর লীলা যে আধারে প্রকাশ করেন, সেখানে বিশেষ শক্তি; ভক্ত-হৃদয়ে তাঁর বিশেষ শক্তি।

৩৭। সংস্কারদোষে মায়া যায় না। অনেক জন্ম সংসারে থেকে থেকে মায়াকে সত্য বলে বোধ হয়।

৩৮। মায়া, জীবজগৎ আছে, অথচ নেই। যতক্ষণ নিজের 'আমি' আছে, ততক্ষণ ওরাও আছে। জ্ঞান-অসির দ্বারা কাটলে পর, আর কিছুই থাকে না; তখন নিজের 'আমি' পর্যন্ত বাজীকরের বাজী হয়ে পড়ে।

সাকার ও নিরাকার

১। সনাতন হিন্দুধর্মে সাকার নিরাকার দুই মানে। সাকার রূপ কি রকম জান? যেমন জলরাশির মাঝ থেকে ভুড়ভুড়ি ওঠে—সেইরূপ। মহাকাশ, চিদাকাশ থেকে এক একটি রূপ উঠছে দেখা যায়।

২। সচ্চিদানন্দ যেন অনন্ত জলরাশি। মহাসাগরের জল ঠাণ্ডা দেশে স্থানে স্থানে যেমন বরফের আকার ধারণ করে, সেইরূপ ভক্তি-হিমে সেই সচ্চিদানন্দ ভক্তের জন্য সাকার রূপ ধারণ করেন। জ্ঞান-সূর্যের তাপে সাকার বরফ গলে যায়। ব্রহ্মজ্ঞানের পর, নির্বিকল্প সমাধির পর, আবার সেই বাক্যমনের অতীত অরূপ নিরাকার ব্রহ্ম।

৩। যারা নিরাকার নিরাকার করে কিছু পায় না, তাদের না আছে বাইরে, না আছে ভেতরে। সাকার তবু বাইরে দর্শন করে আনন্দ পাওয়া যায়। সকলে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী নয়, তাই তিনি সাকার পূজার ব্যবস্থা করেছেন। যার যা পেটে সয়, মা সেই রকম খাবার বন্দোবস্ত করেন।

৪। নিরাকার সাধনা, জ্ঞানযোগের সাধনা, ভক্তদের কাছে বলতে নেই। অনেক কষ্টে একটু ভক্তি হচ্ছে—সব স্বপ্নবৎ বললে ভক্তির হানি হয়।

৫। কোন কোন ভক্তের কাছে তিনি নিত্য সাকার। এমন জায়গা আছে বরফ গলে না; স্ফটিকের আকার ধারণ করে। তিনি সাকার, নিরাকার, আবার সাকার নিরাকারেরও পার।

৬। নিত্য রাধাকৃষ্ণ আর লীলা রাধাকৃষ্ণ। যেমন সূর্য (নিত্য) আর রশ্মি।

৭। তাঁর ইতি করা যায় না। যারই সাকার তারই নিরাকার। অবতারও একটি রূপ।

৮। সাকার চিন্তা করলে শীঘ্র ভক্তি হয়। নিরাকার সাধন বড় কঠিন। কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ না হলে হবে না। বাইরে ত্যাগ, আবার ভেতরে ত্যাগ। বিষয়বুদ্ধির লেশ থাকতে হবে না। সাকার সাধনা সোজা, তবে তত সোজা নয়।

৯। ভক্তের জন্যে তিনি সাকার, রসময় ভগবান। জ্ঞানীর পক্ষে নিরাকার।

১০। ভক্তের জন্যে ভগবানের নরম ভাব হয়, যেমন ঠিক সূর্যোদয়ের সূর্য। সে-সূর্যকে অনায়াসে দেখতে পারা যায়, চোখ ঝলসে যায় না; বরং চোখের তৃপ্তি হয়।

১১। ভক্তেরা, বিজ্ঞানীরা নিরাকার সাকার দুই লয়, অরূপ রূপ দুই গ্রহণ করে।

১২। কেহ বা সাকার দিয়ে নিরাকারে পৌছায়, আবার কেহ বা নিরাকার দিয়ে সাকারে পৌছায়।

১৩। নিরাকারও সত্য, আবার সাকারও সত্য।

১৪। ছায়া, কায়া, ঘট, পট সমান।

১৫। হনুমান সাকার নিরাকার সাক্ষাৎ করে রামমূর্তিতে নিষ্ঠা করে থাকল। চিদ্‌ঘন আনন্দের মূর্তি, সেই রামমূর্তি।

১৬। প্রহ্লাদ কখন দেখতেন 'সোঽহং', আবার কখন দাসভাবে থাকতেন।

১৭। নির্বাণ যে চাই, এমন কিছু না। এই রকম আছে যে নিত্য কৃষ্ণ, তাঁর নিত্য ভক্ত। যেমন চন্দ্র যেখানে, তারাগণও সেখানে।

১৮। যে শরীরে ভগবানের আনন্দলাভ হয়, আর সম্ভোগ হয়, সেটি কারণ-শরীর, তন্ত্রে বলে ভাগবতী তনু। ভক্তের প্রেমের শরীর ভাগবতী তনু দ্বারা সেই চিন্ময় রূপ দর্শন হয়।

জ্ঞান ও ভক্তি

১। অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর।

২। শিবাংশে জন্মালে জ্ঞানী হয়; ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—এই বোধের দিকে মন যায়। বিষ্ণু অংশে জন্মালে প্রেম-ভক্তি হয়।

৩। জ্ঞানীর জড় সমাধি হয়, 'আমি' থাকে না। ভক্তিযোগের সমাধিকে চেতনা বা ভাব-সমাধি বলে। এতে সেব্য সেবকের, রস রসিকের, আস্বাদ্য আস্বাদকের 'আমি' থাকে।

৪। শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধাভক্তি এক। তবে একজন বলছে জল, আর একজন—জলের খানিকটা চাপ।

৫। শুদ্ধজ্ঞান যেখানে, শুদ্ধাভক্তিও সেইখানে নিয়ে যায়। সেখানে (অদ্বৈত অবস্থায়) সব শিয়ালের এক রা।

৬। খুব উঁচু ঘর না হলে একাধারে জ্ঞান ও ভক্তি দুই-ই হয় না।

৭। ঈশ্বর ইচ্ছাময়। তাঁর যদি খুসী হয়, তিনি ভক্তকে ঐশ্বর্যের অধিকারী করেন—ভক্তিও দেন, জ্ঞানও দেন।

কলকাতায় একবার যদি কেউ এসে পড়তে পারে, তা হলে গড়ের মাঠ, সোসাইটি (Asiatic Society) সবই দেখতে পায়।

৮। জগতের মাকে পেলে ভক্তিও পাবে, জ্ঞানও পাবে। কারু কারু আধারে তাঁর কৃপা হলে জ্ঞান ও ভক্তি দুই-ই হতে পারে।

৯। জ্ঞানীর ভেতর একটানা গঙ্গা বইতে থাকে। সে সর্বদা স্ব-স্বরূপে থাকে। ভক্তের একটানা নয়—জোয়ার ভাঁটা। কখন সাঁতার দেয়, কখন ডোবে, কখন ওঠে। যেমন জলের ভেতর বরফ টাপুর-টুপুর, টাপুর-টুপুর করে। হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়।

১০। জ্ঞান হলেই মুক্তি, যেখানেই থাকে—ভাগাড়েই মৃত্যু হোক, আর গঙ্গাতীরেই হোক। তবে অজ্ঞানের পক্ষে গঙ্গাতীর।

১১। জ্ঞান পুরুষ ; ভক্তি স্ত্রীলোক, অন্দরে যেতে পারে।

১২। ঈশ্বরই কর্তা, আর সব অকর্তা—এর নাম জ্ঞান।

১৩। চার-পাঁচ জনের জ্ঞান হয় না—যার বিদ্যার অহঙ্কার, যার পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, যার ধনের অহঙ্কার। তমোগুণের স্বভাব অহঙ্কার। কুম্ভকর্ণের তমোগুণ, রাবণের রজোগুণ। বিভীষণের সত্ত্বগুণ, তাই তিনি রামচন্দ্রকে লাভ করেছিলেন। যাদের শুচিবাই, বাঁকা মন ও যারা সংশয়াত্মা, তাদের জ্ঞান হয় না।

১৪। কুলকুণ্ডলিনী যতক্ষণ নিদ্রিতা থাকেন, ততক্ষণ জ্ঞান হয় না। বসে বসে বই পড়ে যাচ্ছি, বিচার করছি, কিন্তু ভেতরে ব্যাকুলতা নেই, সেটি জ্ঞানের লক্ষণ নয়।

১৫। ভক্তির ‘আমি’তে অহঙ্কার হয় না, অজ্ঞান করে না।

১৬। ভক্তিদ্বারাই মুক্তি হয়, তা ব্রাহ্মণ-শরীর না হলে হয় না, এমন নয়। শবরী ব্যাধের মেয়ে, রুহিদাস শূদ্র ছিল, এদের ভক্তিদ্বারাই মুক্তি হয়েছে।

১৭। ভক্তিপথেও ব্রহ্মজ্ঞান হয়, ভক্তের ‘আমি’ও যায়; তখন ব্রহ্মজ্ঞানে সমাধিস্থ। কিন্তু বরাবর নয়। সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি—‘নি’তে অনেকক্ষণ থাকা যায় না।

১৮। ভক্তি মানে, কায়-মন-বাক্যে তাঁর ভজনা। কায়—হাতে তাঁর পূজা সেবা, পায়ে তাঁর স্থানে যাওয়া, কানে ভাগবত শোনা, নামগুণ-কীর্তন শোনা, চক্ষে বিগ্রহ দর্শন। মনে—তাঁর ধ্যানচিন্তা করা, তাঁর লীলা স্মরণ-মনন করা। বাক্যে—তাঁর স্তবস্তুতি, নামগুণ কীর্তন করা। এই সব সর্বদা করতে করতে ভক্তি লাভ হয়।

১৯। কোন কামনা নেই, তাঁকে ভালবাসি—এটি বেশ। এর নাম অহৈতুকী ভক্তি। শুদ্ধাভক্তিদ্বারা তাঁকে পাওয়া যায়। ভক্তিযোগে সব পাওয়া যায়, ভক্তিই সার।

২০। নিষ্কাম ভক্তিই আসল। যে লোক বড়মানুষের কাছে কিছু চেয়ে ফেলে, সে আর খাতির পায় না।

২১। তাঁ’তে মগ্ন হলেই আর অসৎ বুদ্ধি, পাপবুদ্ধি থাকে না। কথাটা এই—তাঁকে ভালবাসা। তাঁকে ভালবাসলে বিবেক-বৈরাগ্য আপনি আসে।

২২। ভক্তিকামনা কামনার মধ্যে নয়, যেমন হিঞ্চে শাক শাকের মধ্যে নয়। মিছরি-মিষ্টি মিষ্টির মধ্যে নয়। ওঁকার শব্দের

মধ্যে নয়। হিঞ্চে শাকে পিত্ত নাশ হয়, মিছরিতে অম্বল নাশ হয়।

২৩। ধর্মাধর্ম ত্যাগ করলে থাকে শুদ্ধাভক্তি। অধর্ম—কিনা অসৎ কর্ম; ধর্ম—কিনা বৈধীকর্ম—এতো দান করতে হবে, এতো ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হবে—এই সব কর্ম।

২৪। যাদের রাগভক্তি, ঈশ্বর তাদের ভার নেন। বৈধী ভক্তি করতে করতে রাগভক্তি হয়। কারু কারু, রাগভক্তি ছেলেবেলা থেকেই আছে, ছেলেবেলা থেকেই ঈশ্বরের জন্মে কাঁদে। যেমন প্রহ্লাদ। ঈশ্বরের ওপর অনুরাগ, প্রেম এলে জপ, তপ, কর্ম ত্যাগ হয়ে যায়। হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হলে বৈধীকর্ম করবে কে?

২৫। বৈধীভক্তি হতেও যেমন, যেতেও তেমন। কত লোক বলে, 'আরে ভাই, কত হবিষ্যি করলুম, কতবার বাড়িতে পুজো আনলুম, কিন্তু কি হলো?' কিন্তু রাগভক্তির পতন নেই। রাগভক্তি ঈশ্বরে আত্মীয়ের ন্যায় ভালবাসা এলে আর কোন বিধি নিয়ম থাকে না।

২৬। যদি রাগভক্তি হয়, অনুরাগের সহিত ভক্তি, তা হলে তিনি স্থির থাকতে পারেন না।

২৭। বাঘ যেমন কপকপ করে জানোয়ার খেয়ে ফেলে, তেমনি 'অনুরাগ-বাঘ' কাম ক্রোধ—এইসব রিপুদের খেয়ে ফেলে। ঈশ্বরে একবার অনুরাগ হলে কাম ক্রোধ থাকে না।

২৮। প্রেম তিন প্রকার—সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা। চন্দ্রাবলীর প্রেম সাধারণী, শ্রীমতীর সমর্থা প্রেম।

২৯। একাঙ্গী প্রেম—কিনা ভালবাসা একদিক থেকে। যেমন জল হাঁসকে চাচ্ছে না, কিন্তু হাঁস জলকে ভালবাসে।

৩০। তাঁকে লাভ হলে মনে হয়, ঠিক আপনার মা; না হলে মনে হয় দূরের লোক।

৩১। রাগভক্তি এলে সংসার বিদেশ বোধ হয়, স্ত্রী-পুত্রাদির ওপর সে মায়ার টান থাকে না।

৩২। কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ হলে ভাব, ভক্তি, প্রেম—এইসব হয়। এরই নাম ভক্তিযোগ।

৩৩। ভক্তিযোগে কুলকুণ্ডলিনী শীঘ্র জাগ্রত হয়। ইনি জাগ্রত না হলে ঈশ্বরদর্শন হয় না।

৩৪। সত্ত্বগুণে ভক্তি হয়। ভক্তির সত্ত্ব হলে ঈশ্বর বই আর কিছুতেই মন থাকে না। কেবল দেহটা যাতে রক্ষা হয়, ঐটুকু শরীরের ওপর মন থাকে। শরীরের ওপর আদর পেট চলা পর্যন্ত। শাকান্ন পেলেই হল, খাবার ঘটা নেই। পোশাকের আড়ম্বর নেই, বাড়ির আসবাবের জাঁকজমক নেই।

৩৫। প্রেম মানে ঈশ্বরেতে এমন ভালবাসা যে, জগৎ তো ভুল হয়ে যাবেই, আবার নিজের দেহ, যা এত প্রিয়, তা পর্যন্ত ভুল হয়ে যাবে।

৩৬। সংশয়-মেঘ কেটে গেলেই ভক্তির অরুণোদয় হয়।

৩৭। তাঁকে মা বলে ডাকলে শীঘ্র ভক্তি হয়, ভালবাসা হয়। মা বড় ভালবাসার জিনিস কিনা।

৩৮। ঠিক ছেলে মা ছাড়া থাকতে পারে না। তার মা সব জানে। মার ছেলে মাকে ছেড়ে কেমন করে থাকে!

৩৯। তিনি যতক্ষণ 'আমি' রেখে দেন, ততক্ষণ ভক্তিপথই সোজা। আমি তাঁর দাস, তাঁর ভক্ত, তাঁর সন্তান—এ খুব ভাল।

৪০। হাজার জ্ঞানবিচার কর, ভেতরে ভক্তির বীজ থাকলে ফিরে ঘুরে—হরি, হরি, হরিবোল। বিষ্ণু অংশে ভক্তির বীজ যায় না। আমি এক জ্ঞানীর পাল্লায় পড়েছিলাম। এগার মাস বেদান্ত শোনালে, কিন্তু ভক্তির বীজ যায় না, ফিরে ঘুরে সেই মা, মা। ভক্তির বীজ একবার পড়লে অব্যর্থ হয়, ক্রমে গাছ, ফুল, ফল দেখা যায়।

৪১। যে ঠিক ভক্ত, তার কাছে হাজার বেদান্ত বিচার কর আর স্বপ্নবৎ বল, তার ভক্তি যাবার নয়।

৪২। ভক্তি পাকলে ভাব। জীবের ভাব পর্যন্ত। ভাব পাকলে মহাভাব, প্রেম হয়। জীবের মহাভাব বা প্রেম হয় না। ভাব পাকলে, মনন করলেই হয়।

৪৩। ভাবের কাছে ভক্তি ফিকে। ভাব হলে, একাগ্র মন হলে বায়ু স্থির হয়ে যায়, আপনি কুম্ভক হয়। আবার বায়ু স্থির হলেই মন একাগ্র হয়।

৪৪। প্রেমভক্তিই বস্তু, আর সব অবস্তু।

৪৫। আনন্দ তিন প্রকার—বিষয়ানন্দ, ভজনানন্দ, ব্রহ্মানন্দ।

৪৬। নিষ্ঠাভক্তির আর একটি নাম অব্যভিচারিণী ভক্তি। যেমন একডেলে গাছ, সোজা উঠেছে। ব্যভিচারিণী ভক্তি, যেমন পাঁচডেলে গাছ। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি।

৪৭। ত্রিগুণাতীত ভক্তি হলে সব চিন্ময় দেখে।

সর্বধর্ম সমন্বয়

১। সব ধর্মই সত্য। ছাদে ওঠা নিয়ে বিষয়, তা—তুমি পাকা সিঁড়ি দিয়েও উঠতে পার, কাঠের সিঁড়ি দিয়েও উঠতে পার, বাঁশের সিঁড়ি দিয়েও উঠতে পার।

২। এক পুকুরের চারটি ঘাট। হিন্দুরা এক ঘাটে জল খাচ্ছে, বলছে জল; মুসলমানরা আর এক ঘাটে, বলছে, পানি; ইংরাজরা বলছে ওয়াটার। এক ঈশ্বর, তাঁর নানা নাম।

৩। বেদেতে বলেছে, ওঁ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। পুরাণে বলেছে, ওঁ সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ। আর তন্ত্রে বলেছে, ওঁ সচ্চিদানন্দ শিবঃ। একই সচ্চিদানন্দ। সেই ওঁ হতে ওঁ শিব, ওঁ কালী, ওঁ কৃষ্ণ হয়েছেন।

৪। বহুরূপী জানোয়ার কখন কখন নানা রং ধরে, আবার কখন কোন রং নেই, নির্গুণ। (বহুরূপী জানোয়ারের গল্প।)

৫। জ্ঞানী যাঁকে ব্রহ্ম বলে, যোগী তাঁকেই পরমাত্মা বলে এবং ভক্ত তাকেই ভগবান বলে।

৬। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান নানা পথ দিয়ে এক জায়গায়ই যাচ্ছে। একটা পথ দিয়ে ঠিক যেতে পারলে, তাঁর কাছে পৌছান যায়। তখন সব পথের খবর পাওয়া যায়।

৭। এক মায়ের পাঁচ ছেলে। বাড়ীতে মাছ এসেছে। মা মাছের নানা রকম ব্যঞ্জন করেছেন, যার যা পেটে সয়, যার যেটি ভাল লাগে।

৮। যাদের উদার ভাব, তারা সব দেবতাকে মানে—কৃষ্ণ, কালী, শিব, রাম।

৯। যিনি কৃষ্ণ, তিনিই কালী।

১০। তাঁর সম্বন্ধে জোর করে বলো না যে, তিনি এই হতে পারেন, আর এই হতে পারেন না। আমার ধর্মই ঠিক, আর সকলের মিথ্যা—এসব বুদ্ধির নাম মতুয়ার বুদ্ধি।

১১। ঋষিদের ধর্ম সনাতন ধর্ম, অনন্ত কাল আছে ও থাকবে। এই সনাতন ধর্মের ভেতর নিরাকার, সাকার, জ্ঞানপথ, ভক্তিপথ সব আছে। অন্যান্য যে-সব ধর্ম, আধুনিক ধর্ম, কিছু দিনের জন্যে থাকবে, আবার যাবে।

১২। কানারা হাতী দেখতে গিয়েছিল। (কানাদের হাতী দেখার গল্প।) ঈশ্বর সম্বন্ধে যে যতটুকু দেখেছে, সে মনে করেছে, ঈশ্বর এমনি, আর কিছু নয়।

১৩। দেশ-কাল-পাত্রভেদে ঈশ্বর নানা ধর্ম করেছেন। কিন্তু সব মতই পথ, মত কিছু ঈশ্বর নয়। তবে আন্তরিক ভক্তি করে একটা মত আশ্রয় করলে তাঁর কাছে পৌঁছান যায়। যদি কোন মত আশ্রয় করে তাতে ভুল থাকে, আন্তরিক হলে তিনি সে ভুল সুধরিয়ে দেবেন। অন্যের মত ভুল হয়েছে—এ কথায় আমাদের দরকার নেই।

১৪। বেদে তাঁকে সগুণ, নির্গুণ দুই-ই বলেছে। একটা ঠিক জানলে অন্যটার খবর জানা যায়। তিনিই জানিয়ে দেন।

১৫। নানা পথ তাঁর কাছে পৌঁছবার ; যেমন কালীঘাটে যেতে নানা পথ দিয়ে যাওয়া যায়। তবে কোন পথ শুদ্ধ, কোনও পথ নোংরা (ঘোষপাড়া, পঞ্চনামী, বামাচারী)। শুদ্ধ পথ দিয়ে যাওয়াই ভাল।

১৬। যত মত, তত পথ।

১৭। যে মূর্তি ভাল লাগে তারই ধ্যান করবে, কিন্তু জানবে যে সবই এক। কারু ওপর বিদ্বেষ করতে নেই। শিব, কালী, হরি—সব একেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। যার যা প্রকৃতি, যার যা ভাব, সে সেই ভাবটি নিয়ে থাকে। (বারোয়ারীতে নানারূপ মূর্তি করার গল্প।)

১৮। বহিঃ শৈব, হৃদে কালী, মুখে হরিবোল।

১৯। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি (কালী), আবার তিনিই নবরূপে গৌরাঙ্গ। বৈষ্ণব, শাক্ত সকলেরই পৌঁছানোর স্থান এক। তবে পথ আলাদা। যে এক করেছে, সেই ধন্য।

২০। আমি কেন একঘেয়ে হব? আমার মেয়েলি স্বভাব। আমি পাঁচ রকমে মাছ খাই। মাছ খাব তো ভাজাও খাব, সিদ্ধও খাব, ঝোলেও খাব, অম্বলেও খাব। তাঁকে সমাধি অবস্থায় নির্গুণ ভাবেও উপলব্ধি করি, আবার নানা মূর্তির ভেতর ঐহিক সম্বন্ধবোধেও ভোগ করি। আমি কখন পূজা, কখন ধ্যান, কখন বা তাঁর নাম করে নাচি। একঘেয়ে ভাব ভাল লাগে না। তুইও তাই কর—একাধারে জ্ঞানী আর ভক্ত দুই-ই হ'।

২১। কেন শুধু 'সোঽহং' 'সোঽহং' করব! শুধু পোঁ ধরে থাকব! আমি সাত ফোকরে নানা রাগ রাগিণী বাজাব। শুধু ব্রহ্ম ব্রহ্ম কেন করব! শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য, মধুর—সব ভাবে তাঁকে ডাকব, আনন্দ করব, বিলাস করব।

২২। আমায় সব ধর্ম একবার করে নিতে হয়েছিল—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান। আবার শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত। দেখলাম, সেই এক ঈশ্বর, তাঁর কাছেই সকলে আসছে, ভিন্ন পথ দিয়ে।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা

১। জীব সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। জীব ও আত্মার প্রভেদ করেছে 'আমি' মাঝখানে আছে বলে। জলের ওপর যদি একটা লাঠি ফেলে দাও, তা হলে দুটো ভাগ দেখায়, বস্তুত এক জল। লাঠিটার দরুণ দুটো দেখাচ্ছে। অহং-ই ঐ লাঠি। লাঠি তুলে লও, সেই এক জলই থাকবে।

২। জন্মমৃত্যু, জীবজগৎ—সব বাজীকরের বাজী, ভেল্কী। জলই সত্য, জলের ভুড়ভুড়ি এই আছে, এই নেই। যে জলে উৎপত্তি, সেই জলেই লয়। ঈশ্বর যেন সমুদ্র, জীবেরা ভুড়ভুড়ি। ছেলেমেয়ে—যেমন একটা বড় ভুড়ভুড়ির সঙ্গে পাঁচ-ছটা ছোট ভুড়ভুড়ি।

৩। সূর্য ও ঘটে তার প্রতিবিম্ব—পরমাত্মা ও জীবাত্মা। প্রতিবিম্ব ধরে গেলে সত্য-সূর্যের কাছে যাওয়া যায়। শেষ ঘট ভাঙ্গলে কি থাকে, তা মুখে বলা যায় না। যা আছে, তাই আছে। প্রতিবিম্ব-সূর্য না থাকলে সত্য-সূর্য আছে কি করে জানবে? সমাধিস্থ হলে অহংত্ব নাশ হয়। সমাধিস্থ ব্যক্তি নেমে এসে কি দেখেছে, মুখে বলতে পারে না।

৪। শরীর সরা। এই শরীর মধ্যে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কাররূপ

জল রয়েছে। ব্রহ্ম সূর্যস্বরূপ। তিনি এই জলে প্রতিবিম্বিত হচ্ছেন। সেই প্রতিবিম্ব-সূর্য ধ্যান করতে করতে সত্য-সূর্য তাঁর কৃপায় দর্শন হয়।

৫। তিনিই যেন মানুষ শরীরটা নিয়ে হেলেদুলে বেড়াচ্ছেন, যেমন ঢেউএর ওপর একটা বালিস ভাসছে। শরীরটা দুদিনের জন্যে, তিনিই সত্য। শরীর এই আছে, এই নেই।

৬। জড়ের সত্তা চৈতন্য নেয়, আর চৈতন্যের সত্তা জড় নেয়। যেমন শরীরে রোগ হলে, বোধ হয়—আমার রোগ হয়েছে।

৭। অষ্টপাশ-জড়িত আত্মাই জীবাত্মা।

৮। সুখদুঃখ, পাপপুণ্য—এসব আত্মার কোন অপকার করতে পারে না; তবে দেহাভিমানী লোকদের কষ্ট দিতে পারে। ধোঁয়া দেওয়ালকে ময়লা করে, আকাশের কিছু করতে পারে না।

৯। মহাকারণ, শুদ্ধ আত্মা নির্লিপ্ত। তাঁতে মায়া বা অবিদ্যা আছে। শুদ্ধ আত্মাকে দেখা যায় না, যেমন জলে লবণ মিশ্রিত থাকলে লবণকে চক্ষের দ্বারা দেখা যায় না। প্রকৃতি বা আদ্যাশক্তি সকলের কারণ। মনবুদ্ধি অহঙ্কার—সূক্ষ্ম, পঞ্চভূত স্থুল। এই ব্রহ্ম বা শুদ্ধ আত্মাই আমাদের স্বরূপ। মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার—এই চারটি জড়িয়ে লিঙ্গশরীর। এই শরীরটা আত্মার একটা ব্যাধি। জ্ঞান কাকে বলে? এই স্ব-স্বরূপকে জানা, আর তাঁতে মন রাখা।

১০। শিবই জীব হয়ে এই দেহের মধ্যে বাস করছেন।

১১। যার যা ইষ্ট, তার সেই আত্মা। ইষ্ট আর আত্মা

অভেদ। ইষ্ট-সাক্ষাৎকার হলেই আত্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান হলেই ইষ্ট-সাক্ষাৎকার।

১২। অহঙ্কারকেই শাস্ত্রে চিজ্জড়গ্রন্থি বলেছে। চিৎ, অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ আত্মা এবং জড়, অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদি। ঐ অহঙ্কার এই উভয়কে একত্রে বেঁধে রেখে মানব-মনে 'আমি দেহেন্দ্রিয়-বুদ্ধ্যাদিবিশিষ্ট জীব', এই ভ্রম স্থির করে রেখেছে।

১৩। শুদ্ধ আত্মা নির্লিপ্ত, প্রকৃতির পার। শুদ্ধাত্মা নিষ্ক্রিয়, তিন অবস্থার সাক্ষীস্বরূপ। শুদ্ধাত্মা কিরূপ? যেমন চুম্বক পাথর অনেক দূরে আছে, কিন্তু ছুঁচ নড়ছে; চুম্বক পাথর চুপ করে আছে, নিষ্ক্রিয়।

১৪। ব্রহ্মজ্ঞানী ঠিক বুঝতে পারে—আত্মা আলাদা, দেহ আলাদা। ভগবানদর্শনের পর দেহাত্মবুদ্ধি থাকে না।

১৫। যতদিন মায়া থাকে, ততদিন মানুষ ডাবের মত থাকে, তার নেয়াপতি মালায় লেগে থাকে। আর যখন মায়ামুক্ত হয়, তখন হয় ঝুনো, শাঁস আর মালা পৃথক হয়ে যায়। তখন শাঁসটা ভেতরে ঢপর ঢপর করে—আত্মা আলাদা আর শরীর আলাদা হয়। দেহের সঙ্গে আর যোগ থাকে না, যেমন খাপ আর তরবার। ব্রহ্মজ্ঞান হলে বিষয়রস শুকিয়ে যায়, দেহবুদ্ধি চলে যায়।

১৬। এ মনের দ্বারা আত্মাকে জানা যায় না, আত্মা দ্বারাই আত্মাকে জানা যায়। শুদ্ধ-মন, শুদ্ধ-বুদ্ধি, শুদ্ধ-আত্মা একই, কেন না, তিনি-বই আর কেউ শুদ্ধ নেই। কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি গেলেই শুদ্ধ-মন ও শুদ্ধ-বুদ্ধি হয়।

১৭। পিচকারীর কাঠির ন্যায় ঈশ্বর এই দেহে আলগা ভাবে থাকেন।

মুক্তি ও ব্রহ্মজ্ঞান

১। সংসার ও মুক্তি দুই-ই ঈশ্বরের ইচ্ছা। তিনিই সংসারে অজ্ঞান করে রেখেছেন, আবার তিনিই ইচ্ছা করে যখন ডাকবেন, তখন মুক্তি হবে। তিনি ভববন্ধনের বন্ধন-হারিণী-তারিণী।

২। যখন তিনি মুক্তি দেবেন, তখন তিনি সাধুসঙ্গ করিয়ে নেন। আবার তাঁকে পাবার জন্যে ব্যাকুলতা করে দেন—কর্ম গেলে কেরাণীর যেমন ব্যাকুলতা হয়। ব্যাকুলতা হলে ছটফট করে—কিসে ঈশ্বরকে পাব।

৩। যারা অজ্ঞান, তারা যেন মাটির দেওয়ালের ঘরের ভেতর রয়েছে। ভেতরে আলো নেই, আবার বাইরের কোন জিনিস দেখতে পাচ্ছে না। জ্ঞানলাভ হলে পরে যে সংসারে থাকে, সে যেন কাঁচের ঘরের ভেতর আছে—ভেতরে আলো, বাইরে আলো। ভেতরের জিনিসও দেখতে পায়, বাইরের জিনিসও দেখতে পায়।

৪। কেদারের ওদিকে গেলে শরীর থাকে না, সেইরূপ সমাধির পরে ব্রহ্মজ্ঞানের শেষে ২১ দিনে মৃত্যু হয়। কিন্তু কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ না হলে চৈতন্য হয় না। মনের সচরাচর বাস প্রথম তিন ভূমিতে—লিঙ্গ, গুহ্য ও নাভি। তখন মনের আসক্তি কেবল কামিনী কাঞ্চনে। চতুর্থ ভূমি—হৃদয়ে মনের

বাস হলে জ্যোতি দর্শন হয়। পঞ্চম ভূমি—কণ্ঠে মনের বাস হলে ঈশ্বরীয় কথা কইতে ও শুনতে ভাল লাগে। তখন তার মুখ দিয়ে কেবল জ্ঞান-উপদেশ বেরয়। ষষ্ঠ ভূমি—কপালে ভ্রূমধ্যে মন গেলে সচ্চিদানন্দ-রূপ দর্শন হয়, সেই রূপের সঙ্গে আলিঙ্গন, স্পর্শন করতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু পারে না। তখনও একটু 'অহং' থাকে। সপ্তম ভূমিতে মন যখন যায়, তখন 'অহং' আর থাকে না, সমাধি হয়, মনের নাশ হয়। কি বোধ হয়, মুখে বলা যায় না। এ অবস্থায় শরীর অধিক দিন থাকে না, সর্বদা বেহুঁশ, কিছু খেতে পারে না। এই ভূমিতে ২১ দিনে মৃত্যু। ভগবানলাভের পর শরীর থাকলেই বা কি, আর গেলেই বা কি! পঞ্চম ভূমি ও ষষ্ঠ ভূমির মাঝখানে বাচ খেলানো ভাল।

৫। যতক্ষণ 'অহং' থাকে, ততক্ষণ ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান হলে, ঈশ্বরদর্শন হলে 'অহং' নিজের বশে আসে; তা না হলে অহংকে বশ করা যায় না। নিজের ছায়াকে ধরা বড় শক্ত; তবে সূর্য মাথার ওপর এলে, ছায়া আধ হাতের মধ্যে থাকে।

৬। অহঙ্কার থাকতে মুক্তি নেই। যতক্ষণ অহংকার ততক্ষণ অজ্ঞান।

৭। সংসারে দুঃখ কেন? এ সংসার তাঁর লীলা, খেলার মত। দুঃখ, পাপ গেলে লীলা চলে না। চোর চোর খেলায় বুড়ীকে ছুঁতে হয়। খেলার গোড়াতেই বুড়ী ছুঁলে, বুড়ী সন্তুষ্ট হয় না। ঈশ্বরের ইচ্ছা যে, খেলা খানিকক্ষণ চলে।

তারপর ঘুড়ির লক্ষের দুটো একটা কাটে, 'হেসে দাও মা হাতচাপড়ী'—বলে, ভো কাটা!

৮। যারা নির্বাণ প্রার্থনা করে, তারা হীনবুদ্ধি; কেবল ভয়ে ভয়ে সারা। পাকা খেলোয়াড় মন্ত্র পেলে পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়ে দেয়। তাঁদের ঘুঁটি (পাশা) হাতের বশ। যেমন বলে, তেমনি পড়ে; সুতরাং ভয় নেই, নির্ভয়ে খেলে। মা, যে খেলে, তাকে ভালবাসে। যে নির্বাণ চায়, খেলা ভেঙ্গে দিতে চায়, মা তার ওপর তত খুশী নয়।

৯। দত্তাত্রেয়, জড়ভরত ব্রহ্মদর্শনের পর আর ফেরে নাই। দেহাত্ম বুদ্ধি থাকলেই দুটো দেখায়, প্রতিবিম্বটা সত্য বলে বোধ হয়। ঐ বুদ্ধি চলে গেলে 'সোঽহং'—এই অনুভূতি হয়। ব্রহ্মজ্ঞান হলে, সমাধি হলে 'আমি' থাকে না। তাই রামপ্রসাদ বলেছে, 'আপনি যদি না পারিস্ মন, রামপ্রসাদকে সঙ্গে নে না।' রামপ্রসাদের লয়, অর্থাৎ অহংতত্ত্বের লয় হওয়া চাই, তবে সেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়।

১০। তত্ত্বজ্ঞান মানে আত্মজ্ঞান। তৎ মানে পরমাত্মা, আর ত্বং মানে জীবাত্মা। জীবাত্মা আর পরমাত্মা একজ্ঞান হলে তত্ত্বজ্ঞান হয়।

১১। পূর্ণজ্ঞান হলে পাঁচ বছরের ছেলের স্বভাব হয়, তখন স্ত্রী পুরুষ ভেদবুদ্ধি থাকে না। যেমন দত্তাত্রেয়, জড়ভরত।

১২। যতক্ষণ উপাধি ততক্ষণ নানা বোধ, পূর্ণজ্ঞান হলে একবোধ হয়। পূর্ণজ্ঞান হলে তবে বাসনা যায়।

১৩। জ্ঞানী কেবল ঈশ্বরের কথা ভালবাসে, বিষয়ের কথা

হলে, তার বড় কষ্ট হয়। কিন্তু বিষয়ীরা আলাদা লোক। তাদের অবিদ্যা-পাগড়ি খসে না, তাই ফিরে ঘুরে ঐ বিষয়ের কথা এনে ফেলে।

১৪। পূর্ণজ্ঞানী হয়ত গঙ্গাস্নানে মন্ত্রপাঠ করলে না, ঠাকুরপূজা করার সময় ফুলগুলি হয়ত এক সঙ্গে ঠাকুরের চরণে দিয়ে চলে এল, কোনও মন্ত্র-তন্ত্র নেই। পূর্ণজ্ঞানী ও পূর্ণমূর্খ দু'জনেরই বাইরের লক্ষণ এক রকম।

১৫। মন সব কুড়িয়ে আনলে, প্রেমোন্মাদ হলে সর্বভূতে সাক্ষাৎকার হয়। তখন তিনি তার সমস্ত ভার নেন। ছোট ছেলেকেই হাত ধরে খেতে বসিয়ে দেয়, বুড়োদের কে দেয়? তাঁর চিন্তা করে যখন নিজের ভাব নিজে নিতে পারে না, তখনই ঈশ্বর ভার নেন। তার কিছুই কর্তব্য নেই, সব ঋণ থেকে মুক্ত।

১৬। যতক্ষণ দেহবুদ্ধি, ততক্ষণই সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, রোগ, শোক। দেহেরই এই সব, আত্মার নয়। আত্মজ্ঞান হলে এসব স্বপ্নবৎ বোধ হয়।

১৭। মুক্ত হব কবে? 'আমি' যাবে যবে।

১৮। দেহের মৃত্যুর পর তিনি হয়ত ভাল জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন, যেমন প্রসব বেদনার পর সন্তানলাভ।

১৯। যতক্ষণ আবরণ আছে, ততক্ষণ বেদান্তবাদীর সোঽহং ঠিক খাটে না—ততক্ষণ মা, মা বলে ডাকা ভাল। তুমি মা, আমি সন্তান; তুমি প্রভু, আমি দাস। মনিব যদি দাসকে ভালবাসে, তা হলে আবার তাকে বলে—আয়, আমার কাছে

বোস্ ; তুইও যা, আমিও তা। কিন্তু দাস যদি মনিবের কাছে সেধে বসতে যায়, মনিব রাগ করবে না ?

২০। রাজা বসে আছেন, খানসামা যদি রাজার আসনে গিয়ে বসে, আর বলে—"রাজা, তুমিও যা, আমিও তা" লোকে পাগল বলবে। তবে খানসামার সেবাতে সন্তুষ্ট হয়ে রাজা একদিন বলেন—"ওরে, তুই আমার কাছে বোস্, ওতে দোষ নেই ; তুইও যা, আমি তা।" তখন যদি সে গিয়ে বসে, তাতে দোষ হয় না।

২১। সেই আদ্যাশক্তি ব্রহ্মজ্ঞান দিলে, তবে ব্রহ্মজ্ঞান হয় ; তবে বাজীর খেলা দেখা যায়। যতক্ষণ মনের দ্বারা বিচার, ততক্ষণ নিত্যে পৌঁছান যায় না।

২২। 'আমি'-ঘট থাকতে সোঽহং হয় না। যতক্ষণ 'আমি' রয়েছে, ততক্ষণ ভক্তের মত থাকাই ভাল, 'আমি ভগবান', এটি ভাল নয়। ভক্তও তাঁকে ভেবে ভেবে অহংশূন্য হয়ে যায়। আবার দেখে, 'তিনিই আমি, আমিই তিনি।' আরশুলা যখন কুমুরে পোকা হয়ে যায়, তখন সব হয়ে গেল। সেই মুক্তি, যেমন হাঁড়ির মাছ গঙ্গায় ছেড়ে দিলে হয়।

২৩। উত্তম ভক্ত ব্রহ্মজ্ঞানের পর দেখে—তিনিই জীবজগৎ, চতুর্বিংশতিতত্ত্ব হয়েছেন। প্রথমে নেতি নেতি বিচার করে ছাদে পৌঁছাতে হয়, তারপর সে দেখে—ছাদও যে জিনিসে তৈরী, সিঁড়িও সেই জিনিসে তৈরী। তখন দেখে, ব্রহ্মই জীবজগৎ হয়েছেন। স্বপ্নবৎ বলে—না, তিনিই সব হয়েছেন। মোমের বাগানে সবই মোম, তবে নানা রূপ।

২৪। যাদের চৈতন্য হয়েছে, তাদের বেতালে পা পড়ে না, হিসাব করে পাপ ত্যাগ করতে হয় না। ঈশ্বরের ওপর এত ভালবাসা যে, তারা যে কর্ম করে, সেই কর্মই সৎকর্ম। তারা জানে—তিনি যেমন করান, তেমনি করি; যেমন বলান, তেমনি বলি; যেমন চালান, তেমনি চলি।

২৫। চৈতন্য লাভ করলে তবে চৈতন্যকে জানতে পারা যায়।

২৬। তিনি যদি 'আমি' একেবারে পুঁছে দেন, তখন যে কি হয়, মুখে বলা যায় না। যতক্ষণ ঘট, ততক্ষণ দু'ভাগ জল। ঘটের ভেতর এক ভাগ, বাইরে এক ভাগ। ঘট ভেঙ্গে গেলে এক জল—তাও বলবার যো নেই। কে বলবে? ঘটটি কি? 'আমি'ই ঘট। ঐ 'আমি'টি যদি যায়, তা হলে যা আছে, তাই। মুখে বলার কিছু নেই, যেমন কর্পূর পোড়ালে কিছুই বাকি থাকে না।

২৭। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পর খাওয়া-দাওয়ার বিচার থাকে না।

২৮। শুধু জ্ঞানী যারা, তারা ভয়তরাসে। বিজ্ঞানীর কিছুতেই ভয় নেই; তার অখণ্ডে মন লয় হলেও আনন্দ, আবার মন লয় না হলে লীলাতে মন রেখেও আনন্দ।

২৯। যে নিত্য হতে লীলায় ও লীলা হতে নিত্যে যেতে পারে, তারই পাকা জ্ঞান, পাকা ভক্তি।

৩০। লীলা ধরে ধরে নিত্যে যেতে হয়, যেমন সিঁড়ি ধরে ধরে ছাদে ওঠা। নিত্যদর্শনের পর, নিত্য থেকে লীলায় এসে থাকতে হয়—ভক্তি ভক্ত নিয়ে। এইটি পাকা মত। লীলা

অবলম্বনে নিত্যবস্তু লাভ করতে চেষ্টা কর। নিত্যে পৌঁছানর পর ব্রহ্মজ্ঞান।

৩১। নিত্য ও লীলা দর্শন করে দাসভাবে থাক, ভক্তভাবে থাক—যেমন হনুমান। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে লীলা আস্বাদন করে বেড়াও। একবার পাকা 'সোঽহং' হয়ে তারপর দাসভাবে থাক।

৩২। যখন লীলাতে মন নামিয়ে আনেন, তখন দেখি—ঈশ্বর-মায়া-জীব-জগৎ; তিনি সব হয়েছেন।

৩৩। শুধু জ্ঞানী একঘেয়ে। আমি নিত্য লীলা দুই নেই। আমার ভয় নেই, দু'হাত ছেড়ে দিয়েছি; বগলে হাত দিয়ে টিপি নে। (দুই বেয়ানের গল্প)।

৩৪। জনক জ্ঞানী, শুকদেব জ্ঞানের মূর্তি। নারদের ভেতর শুকদেবের ব্রহ্মজ্ঞানও ছিল, আবার ভক্তি নিয়েছিলেন। এঁরা বিজ্ঞানী, ঋষিদের চেয়ে বেশী সাহসী।

৩৫। বিজ্ঞানী কখন নিত্য হতে লীলাতে থাকে, কখন লীলা হতে নিত্যে যায়।

৩৬। নিত্যে পৌঁছে লীলায় থাকা ভাল, যেমন ওপারে গিয়ে আবার এপারে আসা।

৩৭। শুধু জ্ঞানী যেন ভস্ করে ওঠা তুবড়ী। খানিক ফুল কেটে ভস্ করে ভেঙ্গে যায়। নারদ, শুকদেব ভাল তুবড়ী। খানিক ফুল কেটে বন্ধ হয়, আবার নতুন ফুল কাটে, আবার বন্ধ হয়।

৩৮। 'দাস আমি' কিন্তু জলের ওপর রেখার ন্যায়। জল

এক, বেশ দেখা যাচ্ছে, শুধু মাঝখানে একটি রেখা, যেন দু'ভাগ জল। এ 'আমি'ও এক-একবার যায়, তখন সমাধিস্থ। 'আমি তোমার দাস' যে বলে, সে আমিটা লিঙ্গশরীর বা জীবাত্মা।

৩৯। যেখানে ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান, সেখানে চুপ। (সমবয়স্কা মেয়েদের মধ্যে একজনের স্বামী আসার গল্প)।

৪০। ব্রহ্মজ্ঞানের পর, সমাধির পর কেউ কেউ নেমে এসে 'বিদ্যার আমি' নিয়ে থাকে। বাজার চুকে গেলে কেউ কেউ আপনার খুসি মত বাজারে থাকে—যেমন নারদাদি।

৪১। গাঁঠরি-ওঠরি ঠিকঠাক করে সহরের রং দেখে বেড়ান। ব্রহ্মজ্ঞানের পর লীলাআস্বাদন ; সমাধির পর নীচে নামা। দু'এক গ্রাম নেমে এলে ভক্তি-ভক্ত ভাল লাগে।

৪২। সমাধিস্থ পুরুষ লোকশিক্ষা দেবার জন্যে আবার নেমে আসে, আবার কথা কয়। পাকা ঘি-র কোন শব্দ থাকে না, কিন্তু পাকা ঘিয়ে আবার কাঁচা লুচি পড়লে আর একবার ছ্যাঁক কলকল্ করে। পুকুরে কলসীতে জল ভরার সময় ভকভক্ শব্দ হয়, পূর্ণ হয়ে গেলে আর শব্দ হয় না ; তবে আর এক কলসীতে যদি ঢালাঢালি হয় তা হলে আবার শব্দ হয়।

৪৩। তাঁকে দর্শনের পর তিনি যে-'আমি' রেখে দেন, তাকে বলে 'পাকা আমি'। যতক্ষণ 'আমি' আছে, ততক্ষণ সেব্য-সেবকই ভাল।

৪৪। অদ্বৈতভাব শেষকালের কথা, উহা বাক্যমনের অতীত উপলব্ধির বিষয়। জ্ঞান বুদ্ধিসহায়ে বিশিষ্টাদ্বৈত পর্যন্ত বলা ও বোঝা যায়, তখন নিত্য যেমন নিত্য,

লীলাও তেমনি নিত্য। চিন্ময় নাম, চিন্ময় ধাম, চিন্ময় শ্যাম। বিষয়বুদ্ধি-প্রবল সাধারণ মানুষের পক্ষে দ্বৈতভাব। শঙ্কর যা বলেছেন, তাও আছে; রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও আছে।

৪৫। যেখানে ব্রহ্মজ্ঞান, সেখান থেকে সত্ত্বগুণও অনেক দূরে। সংসারই অরণ্য, এই বনে সত্ত্বরজস্তম তিন গুণ ডাকাত, জীবের তত্ত্বজ্ঞান কেড়ে নেয়। (তিন চোরের গল্প)।

৪৬। প্রহ্লাদের যখন তত্ত্বজ্ঞান হত তখন তিনি 'সোঽহং' হয়ে থাকতেন। আবার যখন দেহ-বুদ্ধি আসত, তখন 'দাসোঽহং' ভাবে থাকতেন। (হনুমান প্রসঙ্গ)।

৪৭। শিবের দুই অবস্থা। যখন আত্মারাম, তখন সোঽহং অবস্থা; যখন 'আমি' একটা আলাদা বোধ থাকত, তখন 'রাম, রাম' করে নৃত্য করতেন।

৪৮। অদ্বৈতজ্ঞান হলে চৈতন্য হয়, তবেই নিত্যানন্দ।

৪৯। কামনা থাকতে, ভোগবাসনা থাকতে মুক্তি নেই; তাই খাওয়া-পরা, রমন-ফমন সব করে নেবে।

৫০। মুক্ত অভিমানী মুক্তই হয়, আর বদ্ধ-অভিমানী বদ্ধ হয়। ক্ষণকাল তাঁর সঙ্গে যোগ হলেই মুক্তি।

ঈশ্বরদর্শনের লক্ষণ ও জীবনের উদ্দেশ্য

১। ঈশ্বরদর্শনের লক্ষণ একটি আনন্দ। জ্যোতির্দর্শন হয়। বুকের ভেতর তুবড়ীর মত গুরগুর করে মহাবায়ু ওঠে।

২। যে ঈশ্বরকে ঠিক ঠিক ডাকবে, তার শরীরে মহাবায়ু

গরগর্ করে মাথায় গিয়ে উঠবেই উঠবে। কুণ্ডলিনী সব চক্র ভেদ করে শেষে শিরোমধ্যে গিয়ে পড়েন—এরি নাম, মহাবায়ুর গতি। শেষে সমাধি।

৩। ঈশ্বরলাভ যে হয়েছে, তার লক্ষণ আছে—বালকবৎ, জড়বৎ, উন্মাদবৎ, পিশাচবৎ।

৪। ঈশ্বরলাভ হলে লক্ষণ এই যে, সে ব্যক্তি খোড়ো নারকেলের মত হয়ে যায়; দেহাত্মবুদ্ধি চলে যায়। দেহের সুখদুঃখে তার সুখদুঃখ হয় না, জীবন্মুক্ত হয়ে বেড়ায়।

৫। কামিনী-কাঞ্চনের ওপর ভালবাসা যদি একবার চলে যায়, তা হলে ঠিক বুঝতে পারা যায় যে দেহ আলাদা, আর আত্মা আলাদা। ঐ আসক্তি গেলেই শুদ্ধ মন আর শুদ্ধ বুদ্ধি হয়।

৬। পূর্ণজ্ঞানের লক্ষণ—পূর্ণজ্ঞানে মানুষ চুপ হয়ে যায়। তখন 'আমি'-রূপ নূনের পুতুল সচ্চিদানন্দ-সাগরে গুলে এক হয়ে যায়, ডাইলিউট হয়ে যায়; আর একটুও ভেদবুদ্ধি থাকে না। আর দু'রকম পুতুল আছে, কাপড়ের ও পাথরের।

৭। যখন অমাবস্যা, পূর্ণিমা ভুল হয়ে যাবে, তখন পূর্ণজ্ঞান হয়। ঈশ্বরে ষোলআনা মন গেলে এই অবস্থা।

৮। ভক্ত ও জ্ঞানীর দু'টি লক্ষণ—প্রথম কূটস্থ বুদ্ধি, হাজার দুঃখ-কষ্ট-বিপদ হোক, নির্বিকার; যেমন কামারশালের লোহা। আর দ্বিতীয়—পুরুষকার, খুব রোখ। কাম-ক্রোধ আমার অনিষ্ট করছে, তো একেবারে ত্যাগ। কচ্ছপ যদি হাত-পা একবার ভেতরে সাঁদ করে, চারখানা করে কাটলেও আর

বার করবে না। যেখানে কাম নেই, সেখানেই ঈশ্বর বর্তমান। ঈশ্বরকে দর্শন হলে রমণ-সুখের কোটিগুণ আনন্দ হয়।

৯। জ্ঞানীর স্বভাব শান্ত, অভিমানশূন্য। পূর্ণজ্ঞানীর লক্ষণ—একখানা পুস্তকও সঙ্গে থাকে না, যেমন শুকদেব। তাঁর সবই মুখে। আর শুচি অশুচি ভেদজ্ঞান থাকে না। জ্ঞানী কারু অনিষ্ট করতে পারে না।

১০। যিনি ঈশ্বর লাভ করেছেন, তাঁর 'আমি'টা নামমাত্র থাকে। সে-'আমি'র দ্বারা কোন অন্যায় কাজ হয় না, নামমাত্র থাকে; যেমন নারকেলের বেল্লোর দাগ। তাঁর দ্বারা ছেলেমেয়ের জন্মাদি সৃষ্টির কাজ হয় না, তাঁর কামক্রোধ থাকে না। জ্ঞানীর কামক্রোধের ভঙ্গীটুকু থাকে নামমাত্র, তা'তে কোন ক্ষতি হয় না।

১১। ঈশ্বরের ওপর যত ভালবাসা আসবে, ততই ইন্দ্রিয়-সুখ আলুনী লাগবে।

১২। যার চৈতন্য হয়েছে, তার লক্ষণ—ঈশ্বরীয় কথা-বই আর কিছু বলতে বা শুনতে ভাল লাগে না। যেমন চাতক তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে গেলেও বৃষ্টির জল ছাড়া অন্য জল খাবে না। যে জন মিছরির পানা খেয়েছে, তার চিটে গুড় ছ্যা হয়ে যায়। যত পূর্ব দিকে এগুবে, ততই পশ্চিম দিক পেছনে পড়বে। তাঁর দিকে এক পা এগুলে তিনি একশ' পা এগিয়ে আসেন। তিনি পরম দয়ালু।

১৩। যদি একবার কেউ ঈশ্বরকে জানতে পারে তাহলে হাবজা-গোবজা বিষয় আর জানতে হয় না।

১৪। যখন দেখবে ঈশ্বরের নাম করতে অশ্রু আর পুলক হয়, তখন জানবে, ঈশ্বরলাভ হয়েছে। শুকনো দেশলাই ঘষলেই জ্বলে ওঠে, বিষয়াসক্ত মন ভিজে দেশলাই।

১৫। ঈশ্বরলাভ হলে লজ্জা প্রভৃতি সব পাশ চলে যায়। বিচার বন্ধ হয়ে যায়। ছেলে কাঁদে কতক্ষণ? যতক্ষণ না স্তন পান করতে পায়। তারপরই কান্না বন্ধ হয়ে যায়; তখন কেবল আনন্দ, আনন্দে মার দুধ খায়।

১৬। ঈশ্বরের ওপর ভালবাসা এলে কেবল তাঁরই কথা কইতে ইচ্ছা করে। যে যাকে ভালবাসে, তার কথা শুনতে ও বলতে ভালবাসে। সংসারী লোকদের ছেলের কথা বলতে বলতে লাল পড়ে। কেউ ছেলের সুখ্যাতি করলে বলে, 'ওরে, তোর খুড়োর পা ধোবার জল আন।'

১৭। তাঁকে রাতদিন চিন্তা করলে তাঁকে চারিদিকে দেখা যায়, যেমন প্রদীপের শিখার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাক, তবে খানিকক্ষণ পরে চারদিকে শিখাময় দেখা যায়। যে যাঁকে চিন্তা করে, সে তাঁর সত্তা পায়।

১৮। তাঁর প্রেমের একবিন্দু যদি কেউ পায়, তাহলে কামিনী-কাঞ্চন অতি তুচ্ছ বোধ হয়। যদি একবার তীব্র বৈরাগ্য হয়ে ঈশ্বরলাভ হয়, তা হলে মেয়েমানুষে আর আসক্তি থাকে না। ঘরে থাকলেও আসক্তি থাকে না, ভয় থাকে না। ঈশ্বর বড় চুম্বক পাথর, কামিনী ছোট চুম্বক পাথর, কামিনী কি করবে?

১৯। তাঁকে লাভের পর জ্ঞানের অভাব থাকে না, মা রাশ ঠেলে দেন।

২০। শ্রীমতী যত শ্রীকৃষ্ণের দিকে এগুচ্ছেন, ততই কৃষ্ণের গাত্রগন্ধ পাচ্ছিলেন। ঈশ্বরের দিকে যত যাবে, ততই তাঁ'তে ভাব-ভক্তি হয়। সাগরের দিকে যতই যায়, ততই জোয়ার-ভাঁটা দেখা যায়।

২১। তাঁকে চর্মচক্ষে দেখা যায় না; সাধনা করতে করতে একটি প্রেমের শরীর হয়: তার প্রেমের চক্ষু, প্রেমের কর্ণ। সেই চক্ষে তাঁকে দেখা যায়, সেই কর্ণে তাঁর বাণী শোনা যায়। খুব ভালবাসা হলে চারিদিক ঈশ্বরময় দেখা যায়। খুব ন্যাবা হলেই চারিদিক হলদে দেখায়। তখন আবার 'তিনিই আমি' এইটি বোধ হয়। মাতালের নেশা বেশী হলে বলে, 'আমিই কালী'। গোপীরা প্রেমোন্মত্ত হয়ে বলতে লাগল, 'আমিই কৃষ্ণ।'

২২। ঈশ্বর যদি লাভ না হলো, তা হলে সকলই মিথ্যা। কথাটা এই—সচ্চিদানন্দে প্রেম।

২৩। মানবজীবনের উদ্দেশ্য—ঈশ্বরদর্শন, ঈশ্বরে প্রেম, ঈশ্বরকে ভালবাসা, ভক্ত নিয়ে থাকা—এই আর কি! তবে যাদের খুব পাকা হয়ে গেছে, তাদের ভক্ত না হলেও চলে।

২৪। কি আর তোমরা করবে? তাঁ'তে ভক্তিপ্রেম লাভ করে দিন কাটাও। ভক্তিলাভই মানবজীবনের উদ্দেশ্য।

২৫। সব বাসনা গেলেই ছাদে ওঠা যায়। দোকানদার যতক্ষণ না হিসাব মেটে, ততক্ষণ ঘুমোয় না। খাতার হিসাব ঠিক করে তবে ঘুমোয়। জ্ঞানীর সব বাসনা যায়। পূর্ণজ্ঞান হলে বাসনা থাকে না।

২৬। শেষজন্মে সত্ত্বগুণ থাকে, সরল হয়, ভগবানে মন হয়। নানা বিষয়ে ও বিষয়কর্মে মন থাকে না, উঠে আসে। তাঁর জন্যে মন ব্যাকুল হয়। শেষ জন্মে খ্যাপাটে ভাব থাকে।

স্বাধীন ইচ্ছা

১। যতক্ষণ না ঈশ্বরলাভ হয়, ততক্ষণ 'আমি কর্তা' এই ভুল থাকবে। আমি সৎকাজ করছি, অসৎ কাজ করছি—এইসব ভেদবোধ থাকবেই থাকবে; এই ভেদবোধ তাঁরই মায়া, তাঁর মায়াব সংসার চালানর বন্দোবস্ত; যারা তাঁকে লাভ করেছে, তারা জানে, দেখতেই স্বাধীন ইচ্ছা—বস্তুত তিনিই যন্ত্রী, আমি যন্ত্র; তিনি ইঞ্জিনিয়ার, আমি গাড়ি!

২। যতক্ষণ ঈশ্বরলাভ না হয়, ততক্ষণ মনে হয়—আমরা স্বাধীন। এ ভ্রম তিনিই রেখে দেন, তা না হলে পাপের বৃদ্ধি হত, পাপকে ভয় হত না, পাপের শাস্তি হত না। ঈশ্বরকে না জানলে, তাঁর দর্শন না হলে, 'রামের ইচ্ছা'—এটি ষোলআনা বোধই হবে না। (রামের ইচ্ছার গল্প)।

৩। ঈশ্বরই সব করছেন, এ জ্ঞান হলে তো জীবন্মুক্ত। গাছের পাতাটি পর্যন্ত ঈশ্বরের ইচ্ছা ভিন্ন নড়ে না। স্বাধীন ইচ্ছা কোথায়? সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা। নীচে আগুন জ্বালা আছে, তাই হাঁড়ির ভেতর আলু-পটোল, ডাল-ভাত, সব টগবগ্ করছে, লাফাচ্ছে; আর যেন বলছে, 'আমি আছি' 'আমি লাফাচ্ছি।' শরীর যেন হাঁড়ি, মন-বুদ্ধি জল, ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলো যেন ভাত আলু পটোল। অহং যেন তাদের অভিমান—আমি টগবগ্ করছি। আর সচ্চিদানন্দ অগ্নি।

৪। পুতুলনাচের পুতুল বাজীকরের হাতে বেশ নাচে, হাত থেকে পড়ে গেলে আর নড়ে না, চড়ে না।

৫। কর্মফলও আছে। লঙ্কা খেলে ঝাল লাগবে না? তিনি যদি অহংতত্ত্ব রেখে দেন, তা হলে ভেদবুদ্ধিও রেখে দেন, পাপপুণ্যের জ্ঞানও রেখে দেন। তিনি দু-এক জনের অহঙ্কার একেবারে পুঁছে দেন, তারা পাপপুণ্য, ভালমন্দের পার হয়ে যায়।

৬। কর্মের ফল থাকলই বা? তাঁর ভক্তের আলাদা কথা। ঠিক ভক্তের কোন ভয়ভাবনা নেই, মা সব জানে।

৭। তাঁর কৃপা হলে আর ভয় নেই। বাপের হাত ধরে গেলেও ছেলে বরং পড়তে পারে, কিন্তু ছেলের হাত যদি বাপে ধরে, তার ভয় নেই।

৮। মানুষ বলে, ইন্দ্রিয়রা আপনা-আপনি কাজ করছে, ভেতরে যে চৈতন্যস্বরূপ আছেন, তা ভাবে না।

৯। মহাপুরুষরা বালকস্বভাব। ঈশ্বরের কাছে তাঁরা সর্বদাই বালক। তাঁদের অহঙ্কার থাকে না। তাঁরা দৃঢ় বিশ্বাস করেন যে, তাঁদের সব শক্তি ঈশ্বরের শক্তি, নিজের কিছু নয়।

১০। যাকে যা দেবার তাঁর সব ঠিক করা আছে। (সরার মাপে শাশুড়ীর বৌদের ভাত দেবার গল্প)। দেহধারণ করলে সুখদুঃখ ভোগ আছে। প্রারব্ধ কর্মের ভোগ। কিন্তু ভক্ত বিপদে চৈতন্য হারায় না, যেমন পাণ্ডবরা। খানিকটা কর্ম ভোগ হয়, কিন্তু তাঁর নামের গুণে অনেক কর্মপাশ কেটে যায়। (কানার গঙ্গাস্নানের গল্প)।

বিভিন্ন প্রকার জীব ও ভক্ত

১। জীব চার প্রকার : বদ্ধজীব, মুমুক্ষুজীব, মুক্তজীব ও নিত্যজীব।

২। সংসারী বদ্ধজীব গুটীপোকার মত, মনে করলে কেটে বেরিয়ে আসতে পারে, কিন্তু অনেক যত্নে গুটী তৈরী করেছে, ছেড়ে আসতে পারে না। শেষে তা'তেই মৃত্যু হয়। আবার যেন ঘুনির মাছ, যে পথে ঢুকেছে, সেই পথে বেরিয়ে আসতে পারে ; কিন্তু জলের মধুর শব্দে ও অন্য মাছের সঙ্গে ভুলে থাকে, বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করে না। দু'একটা পালায়, তারা মুক্ত জীব।

৩। একটি আছে নিত্যসিদ্ধের থাক্। তারা জন্মাবধি ঈশ্বরকে চায়। সংসারের কোন জিনিস তাদের ভাল লাগে না। বেদে আছে হোমা পাখীর কথা। অবতারের সঙ্গে যারা আসে, তারা নিত্যসিদ্ধ ; কারু কারু শেষ জন্ম।

৪। নিত্যসিদ্ধ—যেমন মৌমাছি, কেবল ফুলের মধু পান করে। সাধারণ লোক মাছির মত—সন্দেশেও বসে, আবার বিষ্ঠাতেও বসে।

৫। অনেক রকম সিদ্ধ আছে—নিত্যসিদ্ধ, হঠাৎসিদ্ধ, স্বপ্নসিদ্ধ, দৈবসিদ্ধ, কৃপাসিদ্ধ।

৬। পরমহংস তিন গুণের অতীত। পরমহংস দেখে, এসব মায়ার ঐশ্বর্য।

৭। পরমহংস দুই প্রকার : জ্ঞানী পরমহংস, আর প্রেমী

পরমহংস। যিনি জ্ঞানী, তিনি আপ্তসারা; নিজের হলেই হল। যেমন তৈলঙ্গস্বামী। যিনি প্রেমী, যেমন শুকদেবাদি, লোকশিক্ষা দেন।

৮। শুকদেব ব্রহ্ম-সমুদ্র দর্শন-স্পর্শন করেছিলেন, ডুব দেন নাই; তাই ফিরে এসে অত উপদেশ দিয়েছিলেন। দুর্বাসার জ্ঞানোন্মাদ হয়েছিল। জ্ঞানোন্মাদ হলে আর কর্তব্য থাকে না। তখন কালকের জন্যে তুমি না ভাবলে ঈশ্বর ভাববেন।

৯। যোগী দুই প্রকার: বহূদক ও কূটীচক। যোগীর মন সর্বদা ঈশ্বরেতে থাকে। চক্ষু ফ্যালফেলে, চক্ষু দেখলেই বোঝা যায়। যেমন পাখী ডিমে তা দিচ্ছে। সব মনটা সেই ডিমের দিকে, ওপরে নামমাত্র চেয়ে আছে।

১০। যোগী দু'রকম: ব্যক্তযোগী ও গুপ্তযোগী। সংসারে গুপ্তযোগী। সংসারীর পক্ষে মনে ত্যাগ। যোগী পরমাত্মায় পৌঁছে আর ফেরে না।

১১। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী যদি জ্ঞানলাভ করে, তবে ঠিক মল্লিকা ফুলের মত দাগশূন্য। আর জ্ঞানের পর সংসার-খোলায় থাকলে একটু গায়ে লালচে দাগ হতে পারে, তবে সে দাগে কোন ক্ষতি হয় না। চন্দ্রে কলঙ্ক আছে বটে, কিন্তু আলোর ব্যাঘাত হয় না।

১২। যারা জীবকোটী, তাদের বিশ্বাস সহজে হয় না। ঈশ্বরকোটীর বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ। জীবের স্বভাব সংশয়াত্মক বুদ্ধি। তারা বলে—হাঁ, বটে, কিন্তু।

১৩। মানুষের ভেতর দেখ বদ্ধজীবই বেশী। মা তাঁর মহামায়ায় মুগ্ধ করে রেখেছেন।

১৪। সব কলাই-ডালের খদ্দের। শুদ্ধ আধার না হলে ঈশ্বরে শুদ্ধাভক্তি হয় না; এক লক্ষ্য হয় না। নানা-দিকে মন থাকে। কারুর চালুনীর স্বভাব, আবার কারুর কুলোর স্বভাব।

১৫। ঈশ্বরের ওপর টান সকলের হয় না। আধার-বিশেষে হয়, সংস্কার থাকলে হয়। আদাড়েগুলোর হয় না। মলয় পর্বতের হাওয়া লাগলে সব গাছ চন্দন হয়, কেবল শিমুল, অশ্বত্থ, বট আর কয়েকটা গাছ চন্দন হয় না। হাজার লেকচার দাও, বিষয়ী লোকের কিছু করতে পারবে না। চিটেগুড়ের পানা নিয়ে ভুলে থাকলে মিছরির পানার সন্ধান করতে ইচ্ছা হয় না।

১৬। কখন ঈশ্বর চুম্বক হন, ভক্ত ছুঁচ হয়, আবার কখন ভক্ত চুম্বক হয়, তিনি ছুঁচ হন। ভক্ত তাঁকে টেনে লয়। তিনি ভক্তবৎসল, ভক্তাধীন। তাঁর ভক্তের ভয় নেই, ভক্ত তাঁর আত্মীয়, তিনি তাদের টেনে নেবেনই।

১৭। প্রেমিক ভক্ত কখন মনে করে, 'তুমি পদ্ম, আমি অলি'; কখনও 'তুমি সচ্চিদানন্দ-সাগর, আর আমি মীন'; আবার ভাবে, 'আমি তোমার নৃত্যকী'; আর তাঁর সামনে নৃত্যগীত করে।

১৮। ভক্ত কা'কে বলি? যার মন সর্বদা ঈশ্বরেতে আছে। ভক্তের হৃদয় তাঁর আবাসস্থল। তিনি সর্বভূতে আছেন বটে,

কিন্তু ভক্তহৃদয়ে বিশেষভাবে আছেন। ভক্তের হৃদয়ে তিনি লীলা করতে ভালবাসেন।

১৯। ভক্তিমান ব্যক্তির শরীর স্বভাবত কোমল ও হস্তপদাদির গ্রন্থিসকল শিথিল হয়। ভক্তের হৃদয় তাঁর বৈঠকখানা, তাই ভক্তের পূজাতে তাঁর পূজা হয়।

২০। যদি কারো শুদ্ধসত্ত্ব আসে, সে কেবল ঈশ্বরচিন্তা করে। তার আর কিছু ভাল লাগে না। কেউ কেউ প্রারব্ধের গুণে জন্ম থেকে শুদ্ধসত্ত্বগুণ পায়। নিষ্কাম কর্ম করতে করতে রজোমিশান সত্ত্বগুণ ক্রমে শুদ্ধসত্ত্বে পরিণত হয়। শুদ্ধসত্ত্ব হলেই ঈশ্বরলাভ হয়।

২১। বিষয়ীদের দেখলে পর্যন্ত জ্ঞানের দরজায় পর্দা পড়ে যায়।

২২। মানুষগুলো দেখতে সব এক রকম, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির। কারুর ভেতর সত্ত্বগুণ বেশী, কারু রজোগুণ, কারু বা তমোগুণ বেশী। যেমন পুলিগুলি দেখতে একরকম, কিন্তু কারুর ভেতর ক্ষীরের পোর, কারুর ভেতর নারকেল-ছাঁই, আর কারুর ভেতর কলাইএর পোর। ঈশ্বরকে জানবার ইচ্ছা, তাঁর ওপর প্রেম-ভক্তি—এরই নাম ক্ষীরের পোর।

২৩। অনেক তথাকথিত খারাপ লোকের মধ্যে সাধু লোক থাকতে পারে। সাধারণ জীবের মন লিঙ্গ, গুহ্য আর নাভিতে। সাধুরা আগুনের কুণ্ড, আর সংসারী ভিজে কাঠ। আগুনের কাছে গেলে জল ক্রমে শুকিয়ে যায়। সাধুসঙ্গ করলে মনের বিষয়বাসনা-রূপ জল শুকিয়ে যায়।

২৪। অধম ভক্ত বলে—ঈশ্বর আছেন ঐ আকাশের মধ্যে, অনেক দূরে। মধ্যম ভক্ত বলে—ঈশ্বর সর্বভূতে চৈতন্যরূপে, প্রাণরূপে আছেন। উত্তম ভক্ত বলে—ঈশ্বরই নিজে সব হয়েছেন।

২৫। তমোগুণী ভক্ত দেখে—মা পাঁঠা খায়, আর বলিদান করে। রজোগুণী ভক্ত নানা অন্নব্যঞ্জন করে দেয়, হয়ত তিলক, রুদ্রাক্ষের মালা, মালার মধ্যে আবার এক একটা সোনার দানা। গরদ পরে রজোগুণী ভক্তেরা পূজা করে।

২৬। সত্ত্বগুণী ভক্তের পূজার আড়ম্বর নেই। তার পূজা লোকে জানতে পারে না। ফুল নেই তো বিল্বপত্র, গঙ্গাজল দিয়ে পূজা করে। দু'টি মুড়কী কি বাতাসা দিয়ে শীতল দেয়। কখন বা একটু পায়স রেঁধে দেয়। আর আছে ত্রিগুণাতীত ভক্ত। তার বালকের স্বভাব। ঈশ্বরের নাম করাই তার পূজা—শুদ্ধ তাঁর নাম। তারা নৈকষ্য কুলীন।

২৭। উচ্চশ্রেণীর সাধুর অজগরবৃত্তি। বসে খাওয়া পাবে। (ছোকরা সাধুর ভিক্ষার গল্প)।

২৮। কেউ সাধনার জোরে সমাধিস্থ হয়, কিন্তু আর ফেরে না, নীচে এসে খবর দিতে পারে না।

২৯। অবতারের সঙ্গে কল্লান্তের ঋষিরা দেহধারণ করে জগতে আগমন করেন। তাঁরাই ভগবানের সাক্ষাৎ পার্ষদ, তাঁদের দ্বারাই ভগবান কাজ করেন।

৩০। যাঁর মনপ্রাণ, অন্তরাত্মা ঈশ্বরে গত হয়েছে, তিনিই সাধু। যিনি কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী, তিনিই সাধু। যাঁর কাছে

বসলে ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়, ঈশ্বর সত্য, সংসার অনিত্য—এ বোধ হয়, তিনিই সাধু।

শাস্ত্র ও পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার

১। গীতা সব শাস্ত্রের সার। দশবার গীতা বললে যা হয়, তাই গীতার মানে। গীতা সবটা না পড়লেও হয়।

২। যার আসক্তি ত্যাগ হয়েছে ও ঈশ্বরে ষোলআনা ভক্তি হয়েছে, সেই গীতার মর্ম বুঝেছে।

৩। শক্রাদয়ঃ স্তব পড়লেই চণ্ডীপাঠ হয়।

৪। অধ্যাত্ম (-রামায়ণ) জ্ঞান ভক্তিতে পরিপূর্ণ।

৫। ভক্তমাল বেশ বইখানি, ভক্তদের সব কথা আছে। কিন্তু একঘেয়ে, অন্য মতের নিন্দে আছে।

৬। সংসারীর পক্ষে যোগবাশিষ্ঠ, বেদান্ত বড় ভাল নয়। গীতা পড়বে।

৭। শাস্ত্রে আভাসমাত্র পাওয়া যায়, তাই কতকগুলো শাস্ত্র পড়বার দরকার নেই, তার চেয়ে নির্জনে তাঁকে ডাকা ভাল।

৮। শুধু শাস্ত্রজ্ঞানে কি হয়? পাঁজিতে লিখেছে বিশ আড়া জল, পাঁজি টিপলে এক ফোঁটাও পড়ে না।

৯। শাস্ত্রে বালিতে-চিনিতে মিশেল আছে। সাধু চিনিটুকু নিয়ে বালি ত্যাগ করে। সার গ্রহণ করে।

১০। শাস্ত্র-ফাস্ত্র কি? কেবল হাতচিঠির ফর্দ বই তো নয়। জিনিস এসে গেলে ফর্দ ফেলে দেয়।

১১। এখানকার ভাব কি জান? শাস্ত্র ঈশ্বরকে জানার পথ বলে দেয়। পথ জেনে নিয়ে আর শাস্ত্রের কি দরকার? শাস্ত্র হচ্ছে চিঠির কথা, আর ঈশ্বরের বাণী মুখের কথা। আমি মার মুখের কথার সঙ্গে না মিললে কিছুই লই না।

১২। আত্মজ্ঞান-জন্যে শাস্ত্র দরকার নয়, প্রচারকদের জন্যে দরকার।

১৩। শাস্ত্রের রকম রকম অর্থ—শব্দার্থ ও মর্মার্থ। শাস্ত্রমর্ম গুরুমুখে শুনে নিতে হয়। তবে যে বিবেকবৈরাগ্যহীন পণ্ডিত, সে ওড়ে খুব উঁচুতে, কিন্তু নজর ভাগাড়ে, কামিনী-কাঞ্চনে। যার সংসার অনিত্য বলে বোধ হয়নি, তার কাছে উপদেশ লওয়া উচিত নয়। যে কাশী গিয়েছে, তার কাছেই কাশীর কথা শুনতে হয়। যে ঈশ্বরদর্শন করেনি, তার উপদেশ ঠিক ঠিক হয় না। একজন বলেছিল, 'আমার মামার বাড়ি একগোয়াল ঘোড়া আছে।' গোয়ালে আবার ঘোড়া! শুধু পণ্ডিতের কথা গোলমেলে।

১৪। শুধু পণ্ডিত যদি বই লেখে বা উপদেশ দেয়, সে কথা তত ধারণা হয় না। ত্যাগী সাধুর উপদেশই লোকে শোনে।

১৫। তাঁকে লাভ হলেই হল, (শাস্ত্র) সংস্কৃত নাই জানলাম। শুধু পাণ্ডিত্যে মানুষকে ভোলাতে পারবে, কিন্তু তাঁকে পারবে না।

১৬। মা আমাকে বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্রে কি আছে, সব দেখিয়ে দিয়েছে। মা বাগ্‌বাদিনীর এক বিন্দু রশ্মি এলে,

আর সব জ্ঞান ফিকে হয়ে যায়। তার কোন জ্ঞানের অভাব হয় না।

১৭। যতক্ষণ বিচার, ততক্ষণ তাঁকে পায় নাই। ঈশ্বরকে যত লাভ হবে, ততই বিচার কমবে। তাঁকে লাভ হলে আর শব্দবিচার থাকে না, তখন নিদ্রা—সমাধি। (নিমন্ত্রণ খাওয়ার গল্প)।

১৮। বিচার করে এক রকম জানা যায়, তাঁকে ধ্যান করে একরকম জানা যায়, আর তিনি যখন দেখিয়ে দেন, সে এক।

১৯। সরস্বতীর জ্ঞানের একটি কিরণে এক হাজার পণ্ডিত থ হয়ে যায়।

২০। শুধু পণ্ডিতগুলো দরকাচা-পড়া। ঈশ্বরকে না জানলে ভেতরের চুনোপুঁটি বেরিয়ে পড়ে।

২১। পণ্ডিতেরা অনেক জানে শোনে—বেদ, পুরাণ, তন্ত্র ; কিন্তু, শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে ? বিবেক বৈরাগ্য চাই। কামিনী-কাঞ্চনের মধ্যে থাকলে শাস্ত্রের মর্ম বুঝতে দেয় না। সংসারের আসক্তিতে জ্ঞান লোপ হয়ে যায়।

২২। রজোগুণে একটু পাণ্ডিত্য দেখাতে ইচ্ছা হয়। সত্ত্বগুণে সব অন্তর্মুখ আর গোপন।

২৩। গ্রন্থ নয় ; গ্রন্থি ; যে একটু বইটই পড়েছে, তার অহঙ্কার এসে জোটে। পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারও অজ্ঞান।

২৪। ভাগবত-ভক্ত-ভগবান—তিন এক, এক তিন।

২৫। সাধুদের মুখে বেদ উপনিষৎ শুনতে হয়।

জাতিভেদ

১। হরিভক্তি হলে, আত্মজ্ঞান হলে, আর জাতিভেদ বা জাতিবিচার থাকে না। শিশুর যেমন জাতের অভিমান নেই, তত্ত্বদ্রষ্টারও তেমনি জাতের অভিমান লোপ পায়।

২। এক উপায়ে জাতিভেদ উঠে যেতে পারে, সে উপায় ভক্তি। ভক্তের জাত নেই। ভক্তি হলেই দেহমনপ্রাণ শুদ্ধ হয়। ভক্তি হলে চণ্ডাল চণ্ডাল নয়, ভক্তি না থাকলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয়। অস্পৃশ্য জাতি ভক্তি থাকলে শুদ্ধ, পবিত্র হয়।

৩। ভক্তের আবার জাতবিচার কি? ভক্তের অন্ন শুদ্ধ অন্ন, সেখানে খেলে দোষ নেই।

৪। ব্রাহ্মণশরীর না হলে মুক্তি হবে না, এমন কথা নয়। চৈতন্যদেব আচণ্ডালে কোল দিয়েছিলেন।

৫। ব্রাহ্মণ, হাজার দোষ থাকুক, তবু ভরদ্বাজ গোত্র, শাণ্ডিল্য গোত্র বলে সকলের পূজনীয়।

৬। বংশে যদি কোন মহাপুরুষ জন্মে থাকেন, তিনিই টেনে নেবেন, হাজার দোষ থাকুক।

মাতৃজাতি

১। যত স্ত্রীলোক, সব শক্তিরূপা। সব স্ত্রীলোক ভগবতীর এক একটি রূপ। শুদ্ধাত্মা কুমারীতে ভগবতীর বেশী প্রকাশ।

২। সেই আদ্যাশক্তিই স্ত্রীরূপ ধরে রয়েছেন, তাই আমার মাতৃভাব।

৩। ঈশ্বরদর্শন না হলে স্ত্রীলোক কি বস্তু, তা বোঝা যায় না।

৪। যিনি জগতের মা, তিনিই এই মায়ারূপ ধরেছেন।

৫। সব স্ত্রীলোককে ঠিক মা বোধ থাকলে তবে বিদ্যার সংসার করতে পারে।

৬। মা গুরুজন, ব্রহ্মময়ীস্বরূপা। মা যতদিন ছিলেন, নারদ তপস্যায় যেতে পারেনি, মায়ের সেবা করতে হয়েছিল। নিজের মার মূর্তি ধ্যান করা যেতে পারে।

৭। ষিনি সাধু, তিনি স্ত্রীলোককে ঐহিক চক্ষে দেখেন না, মাতৃবৎ দেখেন ও সর্বদাই পূজা করেন ও অন্তরে থাকেন।

৮। যে মেয়েমানুষ থেকে এত সাবধান হতে হয়, সাধনের অবস্থায় যে কামিনী দাবানলস্বরূপ—সিদ্ধ অবস্থায়, ভগবান দর্শনের পর সেই মেয়েমানুষ সাক্ষাৎ ভগবতী, মা আনন্দময়ী।

৯। মেয়ে ভক্তরা আলাদা থাকবে, আর পুরুষ ভক্তরা আলাদা থাকবে, তবেই উভয়ের মঙ্গল।

১০। লজ্জা মেয়েদের বড় দরকার।

কর্ম, সংসার ও সংসারী

১। কর্মযোগ কা'কে বলে জান? কর্মফল সমস্ত ঈশ্বরে সমর্পণ করতে হয়, নিজে কোন ফল কামনা করতে নেই। দাসীর মন দেশে পড়ে থাকে, কিন্তু সব কর্ম করে—এরই নাম মনে-ত্যাগ।

২। ভোগান্ত না হলে, ভোগ ও কর্ম শেষ না হলে ঈশ্বরের জন্যে ব্যাকুলতা আসে না। বৈদ্য বলে—দিন কাটুক, তারপর সামান্য ঔষধে উপকার হবে। রাম বললেন, রাবণের কর্ম ক্ষয় হোক, তবে তার বধের উদ্যোগ হবে। (রাম, নারদ প্রসঙ্গ)।

৩। যখন হরিনামে, কালীনামে, রামনামে চক্ষে জল আসে, তখন সন্ধ্যা-কবচাদির প্রয়োজন নেই, কর্মত্যাগ হয়ে যায়। কর্মের ফল তার কাছে যায় না। ফল হলে ফুল আপনিই ঝরে পড়ে। ফুল দেখা যায়, ফল হবার জন্যে। ভক্তি ফল, কর্ম ফুল।

৪। যতই ঈশ্বরের দিকে এগুবে, ততই কর্মের আড়ম্বর কমে যাবে। এগিয়ে পড়। গৃহস্থের বৌ অন্তঃস্বত্বা হলে শ্বাশুড়ী কর্ম কমিয়ে দেয়।

৫। সচ্চিদানন্দ লাভ হলে সমাধি হয়, তখন কর্ম ত্যাগ হয়ে যায়। মৌমাছি ভন ভন করে কতক্ষণ? যতক্ষণ না ফুলে বসে। কিন্তু সাধকের পক্ষে কর্ম ত্যাগ করলে চলবে না। পূজা, জপধ্যান, সন্ধ্যাকবচাদি, তীর্থ, সবই করতে হয়।

৬। ঈশ্বরের শরণাগত হলে কর্ম ক্ষয় হয়। ঈশ্বরে প্রেম আসলে কর্মত্যাগ আপনি হয়ে যায়। কর্ম যে বরাবরই করতে হয়, তা নয়। প্রারব্ধও আছে, কৃপাও আছে। কৃপাদ্বারা সামান্য ভোগ করেই প্রারব্ধ কেটে যায়।

৭। সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়, গায়ত্রী আবার ও কারে লয় হয়। ওঁকার সমাধিতে লয় হয়। যে নিশিদিন তাঁর চিন্তা করছে, তার সন্ধ্যার কি দরকার?

৮। এক হাতে ঈশ্বর-পাদপদ্ম ধরে থাক, আর এক হাতে কাজ কর। যখন কাজ থেকে অবসর পাবে, তখন দুই হাতেই ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধরে থাকবে। তখন নির্জনে বাস করবে ও কেবল তাঁর চিন্তা ও সেবা করবে।

৯। 'আমি কর্তা, আমি করছি তবে সংসার চলছে, আমার গৃহপরিজন'—এসব অজ্ঞান। 'আমি কর্তা'—এ বোধ থাকলে ঈশ্বরদর্শন হয় না। যে নিজে কর্তা হয়ে বসেছে তার হৃদয়ে ঈশ্বর সহজে আসেন না। কর্ম কতদিন? যতদিন দেহ-অভিমান থাকে। দেহে আত্মবুদ্ধি করার নাম অজ্ঞান।

১০। তিনি যদি ঈশ্বরের আনন্দ একবার দেন, তাহলে আর কেউ সংসার করে না, সৃষ্টিও চলে না। (চালের আড়ৎ ও ইঁদুরের কথা)। ভগবানের আনন্দের আস্বাদ একবার না পেলে সে আনন্দের কথা বুঝতে পারে না। পাঁচ বছরের ছেলেকে কি রমণ-সুখ বোঝান যায়? এক সের ধানে চৌদ্দগুণ খৈ হয়। কামিনী-কাঞ্চনের আনন্দ অপেক্ষা ঈশ্বরের আনন্দ কত বেশী!

১১। শবসাধনার ন্যায় পরিবারদের ঠাণ্ডা রাখতে হয়, তাদের খাওয়া-দাওয়ার যোগাড় করে দিতে হয়; তবে সাধনের সুবিধে হয়।

১২। যাদের ভোগের বাকি আছে, তারা সংসারে থেকেই তাঁকে ডাকবে। ঠিক ঠিক ত্যাগী অন্য কোন আনন্দ নেবে না, কেবল ঈশ্বরের আনন্দ। ভোগান্ত না হলে ব্যাকুলতা হয় না।

১৩। ভগবানের আনন্দ লাভ করলে সংসার আলুনি বোধ হয়। শাল পেলে বনাত ভাল লাগে না। ঈশ্বরের আনন্দ পেলে সংসার কাকবিষ্ঠা হয়ে যায়।

১৪। সংসার করবে, অথচ মাথায় কলসী ঠিক থাকবে, অর্থাৎ ঈশ্বরের দিকে মন ঠিক থাকবে। (চিঁড়েকোটার গল্প)।

১৫। যারা সংসারে আছে, তাদের ১৫ আনা মন ভগবানে দেওয়া উচিত। না দিলে সর্বনাশ! কালের হাতে পড়তে হবে। আর, এক আনায় অন্যান্য কর্ম কর।

১৬। পিঁপড়ের মত সংসারে থাক। এই সংসারে নিত্য ও অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে, বালিতে চিনিতে মেশান। পিঁপড়ের মত চিনিটুকু নেবে। জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে—চিদানন্দ রস, আর বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ করবে। (সংসারে) পানকৌড়ির মত, পাঁকাল মাছের মত থাক। গোলমালে মাল আছে, গোল ছেড়ে মাল নেবে। জলে নৌকা থাকুক, ক্ষতি নেই ; নৌকাতে জল না ওঠে।

১৭। গৃহস্থের ঋণ আছে—দেবঋণ, ঋষিঋণ ও স্ত্রীঋণ—দু' একটি ছেলে হওয়া ও সতী হলে প্রতিপালন করা। স্ত্রী-পুত্র, বাপ-মা, সকলের সেবা করবে, কিন্তু মনে জানবে তারা তোমার কেউ নয়। যেমন বড়মানুষের বাড়ির দাসী। সংসারে থেকে যে তাঁকে ডাকে, সে বীর ভক্ত।

১৮। গৃহস্থাশ্রম কিরূপ জান? যেমন কেল্লার ভেতর থেকে লড়াই করা। যে ত্যাগী, সে তো তাঁকে ডাকবেই, তার আর বাহাদুরি কি? গৃহস্থের ডাক ভগবান বড় শোনেন।

১৯। সংসারে থাক ঝড়ের এঁটো পাতা হয়ে। সংসারে জ্ঞানীর ভয় আছে। কামিনী-কাঞ্চনের ভেতর থাকতে গেলেই একটু না একটু ভয় আছে। কাজলের ঘরে থাকতে গেলে কাল দাগ একটু লাগবেই।

২০। সংসার কেমন? যেমন আমড়া। শস্তের সঙ্গে খোঁজ নেই, কেবল আঁটি আর চামড়া; খেলে হয় অম্লশূল। এখন খা, শেষে শূল হলে ওষুধ নিতে আসিস্।

২১। কামিনীকাঞ্চনই সংসার। সংসার যেন বিশালাক্ষীর দ'। সেঁকুল কাঁটার মত, এক ছাড়ে তো, আর একটি জড়ায়। প্রায় মেঘ আর বর্ষা লেগে আছে, সূর্য দেখা যায় না; দুঃখের ভাগই বেশী।

২২। সংসার-আশ্রম ভোগের আশ্রম। আর কামিনী-কাঞ্চন ভোগ কি আর করবে? সন্দেশ গলা হতে নেবে গেলে টক কি মিষ্টি—মনে থাকে না।

২৩। ঈশ্বরলাভের পর সংসারে বেশ থাকা যায়। বুড়ী ছুঁয়ে, তারপর খেলা কর না!

২৪। সংসারে আসক্তি থাকলে মৃত্যুকালে সেটি দেখা দেয়। মৃত্যুকালে যা মনে করবে, পরলোকে তাই হবে। ঈশ্বরের চিন্তা করে দেহত্যাগ করলে ঈশ্বরলাভ হয়।

২৫। সংসার যে ত্যাগ করেছে, সে অনেকটা এগিয়েছে। মনে ত্যাগ হলেই হল, তা হলেও সন্ন্যাসী। কি জান? সংসার করলে মনের বাজে খরচ হয়ে যায়। এই বাজে খরচ হওয়ার দরুণ যা ক্ষতি হয়, তা আবার পূরণ হয়, যদি কেউ

সন্ন্যাস করে। বাপ প্রথম জন্ম দেন, তারপর দ্বিতীয় জন্ম উপনয়নের সময়, আর একবার জন্ম হয় সন্ন্যাসের সময়।

২৬। কেন তিনি সংসার থেকে ছাড়েন না? রোগ সারবে বলে। কামিনীকাঞ্চন ভোগ করতে ইচ্ছা যখন চলে যাবে, তখন ছাড়বেন। হাসপাতালে নাম লেখালে পালিয়ে আসবার যো নেই। রোগের কসুর থাকলে ডাক্তার সাহেব ছাড়বে না।

২৭। সংসারীরা মাতাল হয়ে রয়েছে। সর্বদাই মনে করে—আমিই সব করছি, আর গৃহ-পরিবার সব আমার। দাঁত ছরকুটে বলে, 'এদের, মাগছেলেদের কি হবে? আমি না থাকলে এদের কি করে চলবে?'

২৮। সংসারীদের মধ্যে কাঁটা বাছতে বাছতে সব যায়, মাছ পাওয়া যায় না। আবার কেউ কেউ বলে, 'কতক তিনি করছেন, কতক আমি করছি।'

২৯। সংসারীদের ঈশ্বরের দিকে মন ক্ষণিক। যেমন তপ্ত খোলায় জল পড়েছে—ছ্যাঁক করে উঠল, তারপরই শুকিয়ে গেল।

৩০। সংসারী ভক্ত যখন পূজা করছে গরদ পরে, তখন বেশ ভাবটি; এমন কি জলযোগ পর্যন্ত এক ভাব। তারপর নিজমূর্তি—আবার রজ-তম।

৩১। সংসারীর সত্ত্বগুণ কিরূপ জান? বাড়িটি এখানে ভাঙ্গা, ওখানে ভাঙ্গা, মেরামত করে না। ঠাকুর-দালানে পায়রাগুলো হাগছে। উঠোনে সেওলা, হুঁশ নেই। আসবাব-

গুলো পুরানো, ফিটফাট করবার চেষ্টা নেই। কাপড় যা-তা, একখানা হলেই হল। লোকটি শান্ত, শিষ্ট, দয়ালু, অমায়িক। কারু অনিষ্ট করে না। খাওয়া পেটচলা পর্যন্ত।

৩২। সংসারীর রজোগুণ—ঘড়ি, ঘড়ির চেন; হাতে আংটি। আসবাব সব ফিটফাট। দেওয়ালে কুইনের ছবি, রাজপুত্রের ছবি, কোন বড়লোকের ছবি। বাড়ি চুনকাম করা। ভাল ভাল পোশাক। চাকরদের পোশাক, এমনি সব। সংসারীর তমোগুণ—নিদ্রা, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার।

৩৩। সংসারের ভেতর, বিষয়কাজের ভেতর রাতদিন থাকলে ঈশ্বরে মন হয় না। যত বিষয়চিন্তা করবে, তত আসক্তি বাড়বে।

৩৪। ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ করে, তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়; তা না হলে আরো জড়িয়ে পড়বে, বিপদ, শোক, তাপ—এসবে অধৈর্য হয়ে যাবে। ঈশ্বরে বেশী মন রেখে খানিকটা মন দিয়ে সংসারের কাজ করবে।

৩৫। সংসারী লোকেরা যখন সুখের জন্যে চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, আর পায় না, আর শেষে পরিশ্রান্ত হয়, যখন কামিনীকাঞ্চনে আসক্ত হয়ে কেবল দুঃখ পায়, তখনই বৈরাগ্য আসে, ত্যাগ আসে।

৩৬। যতক্ষণ ঈশ্বরদর্শন হয় নাই, ততক্ষণ ভাঙ্গা কাঁচা হাঁড়ীর মত কুমোরের হাতে যেতে হবে, অর্থাৎ এই সংসারে আসতে হবে। পাকা হাঁড়ী ভাঙ্গলে কুমোর ফেলে দেয়, নেয় না।

টাকা ও সঞ্চয়

১। সংসারে টাকার দরকার বটে, কিন্তু ও-গুনোর জন্যে বেশী ভেবো না। যদৃচ্ছালাভই ভাল। সঞ্চয়ের জন্যে এত ভেবো না। যারা তাঁকে মনপ্রাণ সমর্পণ করেছে, তাঁর ভক্ত, তাঁর শরণাগত, তারা এ সব অত ভাবে না। যত্র আয়, তত্র ব্যয়। একদিক দিয়ে টাকা আসে, আর একদিক দিয়ে খরচ হয়ে যায়। এর নাম যদৃচ্ছালাভ।

২। জমাবার চেষ্টা বৃথা। অনেক কষ্টে একজন চাক তৈয়ের করে, আর একজন এসে ভেঙ্গে নিয়ে যায়।

৩। বিষয়ীরা ধনের আদর করে, মনে করে— এমন জিনিস আর হবে না।

৪। কৃপণের ধন এই ক'রকমে উড়ে যায়: ১ম—মামলা-মোকদ্দমায়; ২য়—চোর-ডাকাতে; ৩য়—ডাক্তার-খরচে; ৪র্থ—বদ্ ছেলের দ্বারা। দাতার ধন রক্ষা হয়।

৫। ঈশ্বরে যাদের অনুরাগ আছে, তাদের দেওয়া ভাল, টাকার সদ্ব্যবহার হয়। প্রবৃত্তি ভাল নয়, নিবৃত্তিই ভাল।

৬। টাকা, ঐশ্বর্য ভোগের জন্য নয়, দেহের সুখের জন্যে নয়, লোকমান্যের জন্যে নয়। টাকা জীবনের উদ্দেশ্য নয়।

৭। টাকাতে যদি কেউ বিদ্যার সংসার করে, ঈশ্বরের সেবা করে, সাধু ভক্তের সেবা করে, তাতে দোষ নেই।

৮। বেশী টাকা হওয়া ভাল নয়, ডুবে যায়। টাকাও

একটি বিলক্ষণ উপাধি। টাকা হলেই মানুষ আর এক রকম হয়ে যায়।

৯। 'বজ্জাৎ-আমি' কে? যে-'আমি' বলে, আমায় জানে না? আমার এত টাকা! আমার চেয়ে বড় কে? টাকার অহঙ্কার করতে নেই। (জোনাকীর আলো দেওয়ার গল্প।)

১০। টাকা কাছে থাকলেই ভাবনা, অহঙ্কার, দেহের সুখের চেষ্টা, ক্রোধ—এই সব এসে পড়ে। রজোগুণ বৃদ্ধি করে, তা হতেই তমোগুণ। তাই সন্ন্যাসী কাঞ্চন স্পর্শ করে না।

১১। পান খাওয়া, মাছ খাওয়া, তামাক খাওয়া, তেলমাখা—এসব-তাতে দোষ নেই। এসব ত্যাগ করলে কি হবে? কামিনীকাঞ্চন ত্যাগই ত্যাগ।

১২। জড়ে জড় দেয়, সচ্চিদানন্দ দিতে পারে না। টাকায় ডাল-ভাত, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি দেয়, ভগবান দিতে পারে না।

১৩। জুতো পরা থাকলে কাঁটাবনে আর ভয় নেই। ঈশ্বর সত্য, আর সব অনিত্য—এই বোধ থাকলে কামিনী-কাঞ্চনে আর তত ভয় নেই।

১৪। দরবেশ ও পাখী সঞ্চয় করে না। পাখীর ছানা হলে সঞ্চয় করে। সংসারীর সংসার পালন করতে হয়, তাই সঞ্চয় করতে হয়। অসময়ের জন্যে কিছু কিছু সঞ্চয় করে রাখা ভাল।

১৫। যে ঠিক ভক্ত, সে চেষ্টা না করলেও ঈশ্বর তার সব জুটিয়ে দেন। যে ঠিক রাজার বেটা, সে মাসোহারা পায়। যার কোন কামনা নেই, সে টাকাকড়ি চায় না, টাকা আপনি

আসে। তাঁকে লাভ করলে, তিনি সব জোগাড় করে দেন; কোন অভাব রাখেন না।

১৬। শরীর, টাকা—এসব অনিত্য। এর জন্যে এত কেন? দেখ না হঠযোগীদের দশা! শরীর কিসে দীর্ঘায়ু হবে, এই দিকেই নজর! ঈশ্বরের দিকে লক্ষ্য নেই। নেতি, ধৌতি—কেবল পেট সাফ করছেন, ওতে ঈশ্বরলাভ হয় না। যার ঠিক ঠিক ঈশ্বরে ভক্তি আছে, সে শরীর, টাকা—এসব গ্রাহ্য করে না। এ সব অনিত্য, তার জন্য আবার জপ তপ!

ধ্যানযোগ ও সমাধি

১। নিরাকার ধ্যান—স্ব-স্বরূপ চিন্তা—শিবযোগ। বিষ্ণুযোগ—অর্ধেক জগতে, অর্ধেক অন্তরে, নাসাগ্রে দৃষ্টি—সাকার ধ্যান।

২। হৃদয় ডঙ্কাপেটা জায়গা, হৃদয়ে ধ্যান হতে পারে, অথবা সহস্রারে, তবে যেখানে অভিরুচি ধ্যান করতে পার, সব স্থানই তো ব্রহ্মময়।

৩। প্রত্যূষে ও শেষরাত্রে ধ্যান করা ভাল ও প্রত্যহ সন্ধ্যায়। সকাল সন্ধ্যায় মন খুব সত্ত্বভাবাপন্ন থাকে।

৪। যারা সত্ত্বগুণী, তারা ধ্যান করে মনে, বনে, কোণে। কখন বা মশারীর ভেতর ধ্যান করে।

৫। পূজার চেয়ে জপ বড়, জপের চেয়ে ধ্যান।

ধ্যানসিদ্ধ যেই জন, মুক্তি তার স্থান।

৬। তুমি আছ, আর তোমার ইষ্ট আছে, জগতে আর

কেউ নেই—একেই বলে ধ্যান। নামের সঙ্গে নামীর ধ্যান-ধারণা করবে।

৭। আমি ধ্যান করতে করতে দীপশিখার আরোপ করতাম। লালচে রংটাকে বলতাম—স্থূল, তার ভেতরের শাদা ভাগটাকে বলতাম—সূক্ষ্ম, সব-ভেতরের কাল খড়কের মত ভাগটাকে বলতাম—কারণশরীর।

৮। জপধ্যান ছেড়েই আসন থেকে উঠতে নেই, আসনে বসেই ১০।১৫ মিনিট ঠাকুরদের গান করতে হয়। তা হলে সারাদিনটা মন বেশ শান্তিতে থাকবে।

৯। চক্ষু চেয়েও ধ্যান হয়; কথা কইছে, তবুও ধ্যান হয়; যেমন মনে কর—একজনের দাঁতের ব্যামো আছে, কন্‌কন্‌ করে। সব কর্ম করছে, কিন্তু দরদের দিকে মনটা আছে।

১০। গভীর ধ্যানে ইন্দ্রিয়ের কাজ সব বন্ধ হয়ে যায়। মন বহির্মুখ থাকে না, যেন বারবাড়িতে কপাট প'ল। ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয়, সব বাইরে পড়ে থাকবে। সাপ গায়ের উপর দিয়ে যদি চলে যায়, জানতেও পারা যায় না; সাপও জানতে পারে না। মাথায় পাখী বসে জড় মনে করে। বর কত রোসনাই করে কাছ দিয়ে গেল, ব্যাধের হুঁশ নেই। যেমন পুকুরে মাছ ধরার সময় ফাতনায় লক্ষ্য থাকলে বাহিরের কিছু শোনা যায় না।

১১। কামনা আশ্রয় করলে কিরূপে মন বসে? ধ্যানে বসে কোন বর চাইতে নেই। কামনা থাকতে যত সাধন কর না কেন, সিদ্ধিলাভ হয় না।

১২। ব্রহ্মচর্য থাকলে মনের শক্তি বেড়ে যায়। ঠিক ঠিক

ব্রহ্মচারী না হলে ঠিক ঠিক ধ্যান হওয়া অসম্ভব। তাঁকে পেতে হলে ব্রহ্মচর্য চাই।

১৩। ধ্যান করবার সময় তাঁ'তে মগ্ন হতে হয়। ওপর ওপর ভাসলে কি জলের নীচের রত্ন পাওয়া যায়? আগে ডুব দাও, রত্ন তোল, তারপর অন্য কাজ।

১৪। প্রণবের ধ্বনি সর্বদাই এমনি হচ্ছে, পরব্রহ্ম থেকে আসছে। সেই ধ্বনি একদিকে পরব্রহ্ম থেকে ওঠে, অন্যদিকে নাভি থেকে ওঠে।

১৫। সমাধির জগৎই আলাদা। সে জগতের খবর মুখে বলা যায় না। দুই ভ্রূর মধ্যস্থলে জ্ঞাননেত্র আছে। সেটা ফুটলে চারিদিকে আনন্দময় দেখায়।

১৬। থিয়েটারে পর্দা উঠে গেলে, তখন সমস্ত মনটা অভিনয়ে যায়, আর বাহ্য দৃষ্টি থাকে না—এরই নাম সমাধিস্থ হওয়া। আবার পর্দা পড়ে গেলে বাইরে দৃষ্টি। মায়ারূপ যবনিকা পড়ে গেলে আবার মানুষ বহির্মুখ হয়।

১৭। সমাধি পাঁচ প্রকার: (১) পিঁপড়ের গতি। (২) মীনের গতি। (৩) তির্যক গতি। (৪) পাখীর গতি। (৫) বানরের গতি। সমাধি হলে রূপটুপ উড়ে যায়। তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলে বোধ হয় না।

১৮। নাদ ভেদ হলে তবে সমাধি হয়। ওঁকার সাধনা করতে করতে নাদ ভেদ হয়।

১৯। শ্মশানে বসে ধ্যান করতে হয়। মৃত্যুচিন্তা করলে ভোগে মন যায় না। ব্যাকুলতা আসে।

২০। বাড়ির কাছে, বাড়ি থেকে আধপো অন্তরে এমন একটা আড্ডা, অর্থাৎ ধ্যানের জায়গা করতে হয়, যেখান থেকে বাড়িতে এসে অমনি একবার ভাত খেয়ে যেতে পার।

উপায়—সাধন ভজন

১। রাজযোগের উদ্দেশ্য—ভক্তি, প্রেম, জ্ঞান, বৈরাগ্য। হঠযোগের উদ্দেশ্য—সিদ্ধাই, দীর্ঘায়ু, অষ্টসিদ্ধি, এই সব। হঠযোগ ভাল নয়, বেদান্তবাদীরা মানে না।

২। যোগীরা যে স্মরণ মনন করেন, তার নাম মনোযোগ। তাঁ'তে যখন মনের যোগ হয়, তখন ঈশ্বরকে খুব কাছে, হৃদয়ের মধ্যে দেখে। যতই এই যোগ হবে, ততই বাইরের জিনিস হতে মন সরে আসবে।

৩। সাধনা তিন প্রকার: সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক। সাত্ত্বিক সাধনায় তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকে বা শুদ্ধ তাঁর নামটি নিয়ে থাকে, কোন ফলাকাঙ্ক্ষা নেই। রাজসিক সাধনায় নানাপ্রকার প্রক্রিয়া—এতবার পুরশ্চরণ, এত তীর্থ, পঞ্চতপা, ষোড়শ উপাচারে পূজা প্রভৃতি করতে হবে। তামসিক সাধনা—তমোগুণ আশ্রয় করে সাধনা। জয় কালী! কি, তুই দেখা দিবি না! এই গলায় ছুরি দেব, যদি দেখা না দিস্! এ সাধনায় শুদ্ধাচার নেই, যেমন তন্ত্রের সাধন।

৪। ভক্তির তম আনবে। মার কাছে জোর কর। তোমার যে আপনার মা গো! একি পাতান মা? একি ধর্ম-মা? এতে জোর চলবে না তো কিসে জোর চলবে?

যার যাতে সত্তা থাকে, তার তাতে টানও থাকে। মায়ের টান বাপের চেয়ে বেশী।

৫। তাঁকে ডাকবার সময় একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়—সখী-ভাব, দাসী-ভাব, সন্তান-ভাব, বীর-ভাব। আমার ভাব মাতৃ-ভাব, সন্তান-ভাব। এ ভাব দেখলে মায়াদেবী পথ ছেড়ে দেন লজ্জায়। মাতৃভাব অতি শুদ্ধ ভাব। তন্ত্রে বামাচারের কথা আছে, কিন্তু সে ভাব ভাল নয়; বীর-ভাবে প্রায়ই পতন হয়, ভোগ রাখলেই ভয়।

৬। মাতৃ-ভাব যেন নির্জলা একাদশী, কোন ভোগের গন্ধ নেই। এতে কোন বিপদ নেই। স্তন—মাতৃস্তন, যোনি—মাতৃযোনি। এই মাতৃভাব সাধনের শেষ কথা। তুমি মা, আমি তোমার ছেলে, এই শেষ কথা। কলিতে বেদমত চলে না, তন্ত্রোক্ত মাতৃভাবে সাধন কর।

৭। মার কাছে ব্যাকুল হয়ে ডাক। আপনার মা-বোধ থাকলে এখুনি হয়। তাঁকে দেখার জন্যে অন্তত একবার কাঁদ।

৮। আমার বাঁদর-ছা'র ভাব নয়, বিড়াল-ছা'র ভাব। বিড়াল-ছা কেবল মিউ মিউ করে ডাকে। তার মা যেখানে রাখে—কখন হেঁসেলে রাখছে, কখনো বাবুদের বিছানায়। ছোট ছেলে মাকে চায়। মার কত ঐশ্বর্য সে জানে না, জানতে চায়ও না। সে জানে আমার মা আছে; আমার ভাবনা কি?

৯। আমার সন্তান-ভাব। ছেলে খায়, দায়, বেড়ায়, অতশত জানে না। আমি খাবো, দাবো, আর বাছে যাবো।

১০। বিশ্বাস কর, নির্ভর কর; তাহলে নিজের কিছু করতে হবে না। মা-কালী সব করবেন।

১১। তাঁকে আম্‌মোক্তারি (বকলমা) দাও, যা হয় তিনি করুন। তুমি বিড়ালছানার মত কেবল তাঁকে ডাক—ব্যাকুল হয়ে। বড় লোকের ওপর যদি ভার দেওয়া যায়, সে লোক কখন মন্দ করবে না। তাঁর ওপর আন্তরিক সব ভার দিয়ে, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাক।

১২। ঈশ্বরের শরণাগত হয়ে তাঁকে ডাকলে তিনি শুনবেনই শুনবেন। সব সুযোগ করে দেবেন। হয়ত বিয়ে হল না, হয়ত ভায়েরা রোজগার করতে লাগল, বা একটি ছেলে মানুষ হয়ে গেল; তাহলে সংসার দেখতে হল না; ষোল আনা মন ঈশ্বরের দিকে দিতে পারা যায়। (ছেলের অসুখ ও ঔষধ পাওয়ার গল্প।)

১৩। তাঁর কাছে কাঁদতে হয়। কাঁদতে কাঁদতে সূচের মাটি ধুয়ে যায়। সূচের মাটি অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, পাপবুদ্ধি, বিষয়বুদ্ধি। মাটি ধুয়ে গেলেই মনরূপ সূচকে চুম্বকরূপে ঈশ্বর টেনে নেন। কাঁদলে কুম্ভক আপনি হয়, তারপর সমাধি।

১৪। শুধু নাম করে যাচ্ছি, কিন্তু কামিনী-কাঞ্চনে মন রয়েছে, তাতে কি হয়? ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হওয়া দরকার। বিছে বা ডাকুর কামড় অমনি মন্ত্রে সারে না, ঘুঁটের ভাবরা দিতে হয়। শুধু হরিনাম করলে কি হবে? আন্তরিক কাঁদতে হবে।

১৫। ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তবে তিনি দেখা দেন।

ভগবানের জন্যে তোমার প্রাণ—জলে চুবিয়ে ধরলে যেরূপ প্রাণ আঁকুবাঁকু করে, সেইরূপ যদি করে—তবেই তাঁকে পাবে। 'মা যাব'—শিশুর এই ব্যাকুলতা। খেলা, খাওয়া কিছুই ভাল লাগে না। ভোগান্তে এই ব্যাকুলতা।

১৬। ঈশ্বরের জন্যে প্রাণ আঁকুবাঁকু করলে জানবে যে দর্শনের আর দেরি নেই। অরুণ উদয় হলে, পূর্বদিক লাল হলে বোঝা যায় সূর্য উঠবে।

১৭। ব্যাকুলতা যত বাড়বে, ততই তাঁর কৃপা অধিক হতে অধিকতর হবে। তিনি খুব কান-খড়কে, সব শুনতে পান। তুমি যত ডেকেছ, সব শুনেছেন। একদিন না একদিন দেখা দেবেনই। অন্তত মৃত্যুসময়েও দেখা দেবেন।

১৮। তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকতে ডাকতে তাঁর কৃপা হয়। ছেলে অনেক দৌড়াদৌড়ি করছে দেখে মার দয়া হয়। মা লুকিয়ে ছিলেন, এসে দেখা দেন। তাঁর ইচ্ছা যে খানিক দৌড়াদৌড়ি হয়, তবে আমোদ হয়। কিন্তু, কান্না শুনে আর থাকতে পারেন না, এসে দেখা দেন। কলিতে বলে একদিন একরাত কাঁদলে ঈশ্বরদর্শন হয়।

১৯। তিন টান এক সঙ্গে হলে ঈশ্বরদর্শন হয়—সন্তানের ওপর মায়ের টান, সতী স্ত্রীর স্বামীর ওপর টান, বিষয়ীর বিষয়ের ওপর টান।

২০। আন্তরিক হলে তিনি শুনবেনই শুনবেন। ব্যাকুল হয়ে তাঁকে প্রার্থনা কর। চিত্তশুদ্ধি হলে, বিষয়াসক্তি চলে গেলে ব্যাকুলতা আসবে, তোমার প্রার্থনা ঈশ্বরের নিকট পৌঁছবে।

২১। তোরা আর কিছু না পারিস্, মার ঘ্যানঘেনে ছেলে হ'। মার কাছে নিয়ত ঘ্যানঘ্যান করলে মা শেষকালে কোলে নেবেন।

২২। হাজার চেষ্টা কর, তাঁর কৃপা না হলে কিছুই হয় না। কৃপা কি সহজে হয়? অহঙ্কার একেবারে ত্যাগ করতে হবে। ভাঁড়ারে একজন থাকলে আর সেখানে বাড়ির কর্তা যায় না। কৃপা হলে অসম্ভব সম্ভব হয়, ঈশ্বরের দর্শন হয়। তাঁর দয়া হলে কি না হয়?

২৩। লোকে সাধনভজন করে, কিন্তু মন কামিনী-কাঞ্চনে ভোগের দিকে; তাই সাধনভজন ঠিক হয় না। বাসনাযোগ দিয়ে সব বেরিয়ে যায়।

২৪। তিনি শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর। গুরুর উপদেশে চিত্ত শুদ্ধ হয়। যে শুদ্ধ ভক্ত, সে কখনও ঐশ্বর্য চায় না।

২৫। তোমাদের 'আপো ধন্বন্ত্যা' ওসব করতে হবে না, তোমাদের গায়ত্রী জপলেই হবে।

২৬। জপাৎ সিদ্ধি। জপ করা—কিনা, নির্জনে নিঃশব্দে তাঁর নাম করা। একমনে নাম করতে করতে, জপ করতে করতে তাঁর রূপ দর্শন হয়। জপ করতে করতে মগ্ন হয়ে যেতে হয়, তবেই তাঁর সাক্ষাৎকার হয়। যে তাঁর নাম নেয়, তার কোন দুঃখ থাকে না। প্রথমে জপ, তারপর ধ্যান ও পরে ভাব।

২৭। শুধু ব্রহ্ম ব্রহ্ম বললে কি হবে যদি বিবেক বৈরাগ্য না থাকে? ও তো ফাঁকা শঙ্খধ্বনি। (শঙ্খধ্বনির গল্প।)

২৮। তাঁর নামবীজের খুব শক্তি, অবিদ্যা নাশ করে।

বীজ এত কোমল, অঙ্কুর এত কোমল, তবু শক্ত মাটি ফেটে যায়। লাগাম কাট, তাঁর নামের গুণে কাট। কালী নামেতে কালপাশ কাটে।

২৯। যদি তীব্র বৈরাগ্য হয় তবে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। যার হয়, তার বোধ হয় সংসার দাবানল! জ্বলছে! মাগছেলেকে দেখে যেন পাতকুয়ো। তবে মনে করলেই ত্যাগ করা যায় না। প্রারব্ধ, সংস্কার—এসব আবার আছে।

৩০। বিষয়বুদ্ধি না গেলে উদার, সরল হয় না। উদার সরল হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। শেষ জন্ম বা অনেক তপস্যা না থাকলে উদার সরল হয় না।

৩১। উপায়—সাধুসঙ্গ আর প্রার্থনা। সাধুসঙ্গ সর্বদাই দরকার, রোগ লেগেই আছে। সাধুসঙ্গ করতে করতে ঈশ্বরের জন্যে প্রাণ ব্যাকুল হয়। যেমন বাড়ির কারুর অসুখ হলে সর্বদাই মন ব্যাকুল হয়ে থাকে—কিসে রোগী ভাল হয়।

৩২। সাধুসঙ্গ, বিবেক, সদ্গুরুলাভ—একটা সুযোগ হওয়া চাই। ঈশ্বরে ভক্তি থাকলে লোক সাধুসঙ্গ আপনি খুঁজে নেয়। গাঁজাখোর গাঁজাখোরের সঙ্গে থাকে। অন্য লোক দেখলে মুখ নীচু করে চলে যায়, বা লুকিয়ে পড়ে। কিন্তু আর একজন গাঁজাখোর দেখলে মহা আনন্দ, হয় তো কোলাকুলি করে।

৩৩। অভ্যাস ও অনুরাগ—এই দুটি উপায়। রোজ তাঁকে ডাকার অভ্যাস করতে হয়।

৩৪। উপায়—অভ্যাসযোগ। অভ্যাস কর, দেখবে মনকে

যে দিকে নিয়ে যাবে, সেই দিকেই যাবে। অভ্যাসদ্বারা মনে অসাধারণ শক্তি এসে পড়ে।

৩৫। অনুরাগের ঐশ্বর্য কি কি?—বিবেক, বৈরাগ্য, জীবে দয়া, সাধুসেবা, সাধুসঙ্গ, ঈশ্বরের নামগুণ-কীর্তন, সত্য কথা—এই সব। এই সব অনুরাগের লক্ষণ দেখলে ঠিক বলতে পারা যায়, ঈশ্বরদর্শনের আর দেরি নেই। অনুরাগ আগে, পরে প্রার্থনা। (বাবুর কোন খানসামার বাড়ি যাওয়ার গল্প।)

৩৬। তাঁর নামে বিশ্বাস কর, তা হলে আর তীর্থাদিরও প্রয়োজন থাকবে না। তাঁর শরণাগত হও, তিনিই রক্ষা করবেন।

৩৭। উপায়—নারদীয় ভক্তি। সব মন তাঁকে না দিলে তাঁর দর্শন হয় না।

৩৮। নির্জন না হলে ভগবান-চিন্তা হয় না। মাঝে মাঝে দিনকতক নির্জনে থেকে বেশী করে তাঁকে ডাকতে হয়। তবে সময় না হলে কিছু হয় না। কারু কারু ভোগ, কর্ম অনেক বাকি থাকে। ছেলে বলেছিল, 'মা আমি ঘুমুই—আমার বাহ্যে পেলে, তখন তুমি তুলো।' মা বললেন, 'বাবা. বাহ্যেতেই তোমাকেই তুলবে, আমায় তুলতে হবে না।'

৩৯। সর্বদা সদসৎ বিচার করতে হয়। ঈশ্বরই সৎ—কিনা নিত্যবস্তু, আর সব অসৎ—কিনা অনিত্য।

৪০। বিচার সর্বদা করতে হয়। সুন্দরীর দেহেতে কেবল হাড়, মাংস, চর্বি, মলমূত্র—এইসব আছে। টাকায় ডালভাত হয়, ভগবান লাভ হয় না।

৪১। বিষয়চিন্তা যত পার ত্যাগ কর। বিষয়ের কথা একেবারে ছেড়ে দেবে। ঈশ্বরের কথা-বই অন্য কথা বোলো না। বিষয়ী লোক দেখলে সরে যাবে। একেবারে বিষয়াসক্তি ত্যাগ।

৪২। ভাবের ঘরে চুরি না থাকে, আর মন মুখ এক রাখাই সাধন। মন মুখ এক করা চাই।

৪৩। বিষয়াসক্তি যত কমবে, ঈশ্বরের প্রতি মতি তত বাড়বে। যত পূবে এগুবে তত পশ্চিম পেছনে পড়বে।

৪৪। সংসারে নির্লিপ্তভাবে থাকতে গেলে কিছু সাধন চাই। মনে মনে বলতে হয়—তিনিই আমার সর্বস্ব। হায়! কেমন করে তাঁকে পাব?

৪৫। কাজের সময় সব মনটা তাঁর কাছে ফেলে রাখতে হয়। যেমন—পিঠে ফোঁড়া হয়েছে, সব কাজ করছি, কিন্তু মন ফোঁড়ার দিকে রয়েছে।

৪৬। দুধে মাখন আছে শুধু বললেই হয় না। দুধকে দই পেতে মন্থন করে মাখন তুলতে হয়, তবে নির্জন চাই।

৪৭। অন্তরে কি আছে জানবার জন্যে একটু সাধন চাই। প্রথমটা একটু উঠে পড়ে লাগতে হয়। যতক্ষণ ঢেউ, ঝড়তুফান থাকে, ততক্ষণ মাঝিরা দাঁড়িয়ে হাল ধরে। যদি বাঁক পার হয়ে গেল, আর অনুকুল হাওয়া বইল, তখন মাঝি আরাম করে বসে হালে হাতটা ঠেকিয়ে রাখে। কামিনী-কাঞ্চনের ঝড়তুফানগুলো কাটিয়ে গেলে তখন শান্তি—পেন্সন ভোগ।

৪৮। ভক্ত মায়া ছেড়ে দেয় না, মহামায়ার পূজা করে। শরণাগত হয়ে বলে, 'মা, পথ ছেড়ে দাও, তুমি পথ ছেড়ে দিলে

তবে ব্রহ্মজ্ঞান হবে। তাই সেই শক্তিরূপিণী মার শরণাগত হতে হয়।

৪৯। মিটিং, স্কুল, এসব অনিত্য। সব মন দিয়ে তাঁকে আরাধনা করতে হয়। শরীর এই আছে, এই নেই; তাড়াতাড়ি তাঁকে ডেকে নিতে হয়।

৫০। যারা একান্ত না পারবে, তারা দু'বেলা খুব দুটো করে প্রণাম করবে। তিনি তো অন্তর্যামী, বুঝছেন যে এরা কি করে। অনেক কাজ করতে হয়। নমস্কারেতেও তাঁর পূজা হয়।

৫১। সত্য কথাই কলির তপস্যা। সত্যেতে থাকবে, তাহলেই ঈশ্বর লাভ হবে। যে সত্যটি ধরে আছে, সে ভগবানের কোলে শুয়ে আছে।

৫২। লজ্জা, ঘৃণা, ভয়—তিন থাকতে নয়।

৫৩। সন্ধ্যা হলে সব কর্ম ছেড়ে হরি স্মরণ করবে। হাতের লোম যদি গোনা না যায়, তা হতে বুঝবে—সন্ধ্যা হয়েছে। অন্ধকারে ঈশ্বরকে মনে পড়ে। সবই এই দেখা যাচ্ছিল, কে এরূপ করলে? মুসলমানরা দেখ সব কাজ ফেলে ঠিক সময় নামাজটি পড়বে।

৫৪। হাততালি দিলে যেমন গাছের ওপরের পাখী সব পালায়, তেমনি সব পাপ তাঁর নামগুণ-কীর্তনে চলে যায়।

৫৫। মেঠো পুকুরের জল যেমন সূর্যের তাপে আপনা-আপনি শুকিয়ে যায়, তেমনি তাঁর নামগুণ-কীর্তনে পাপ-পুষ্করিণীর জল আপনাআপনি শুকিয়ে যায়।

৫৬। প্রকৃতিভাব আরোপ করলে কামাদি রিপু নষ্ট হয়।

৫৭। তাঁর নাম করলে সব পাপ কেটে যায়। কাম, ক্রোধ, শরীরের, সুখ-ইচ্ছা—এসব পালিয়ে যায়।

৫৮। ঢিমে-তেতালা হলে হবে না। মহাজনদের কথায় বিশ্বাস করে, ভক্তি-চার ফেলে মন-ছিপ, প্রাণ-কাঁটা ও নাম-টোপ দিয়ে বসে থাকলে ঈশ্বররূপ মাছ ধরা যায়।

৫৯। ত্যাগ করতে ঈশ্বরের কাছে পুরুষকারের জন্যে প্রার্থনা করতে হয়। যা মিথ্যা বলে বোধ, তা তৎক্ষণাৎ ত্যাগ। এই পুরুষকারের দ্বারা ঋষিরা ইন্দ্রিয় জয় করেছিলেন। খুব রোক চাই—দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, তবে সাধন হয়।

৬০। পাকা আমি—আমি তাঁর দাস, তাঁর সন্তান—এ অভিমান ভাল। আমি তাঁর নাম করেছি, আমার আবার পাপ! কেবল পাপী পাপী করলে পাপীই হয়ে যায়। ভূত ভাবতে ভাবতে ভূতই হয়ে যায়।

৬১। ভক্ত বলে, "যদি 'আমি' সহজে না যায়, তবে থাক্ শালা দাস হয়ে, ভক্ত হয়ে।" যার মনে আছে চেষ্টা দরকার, তার চেষ্টা করতেই হবে।

৬২। যেমন ভাব, তেমন লাভ। (দুই বন্ধুর ভাগবত শুনতে যাওয়ার গল্প)।

৬৩। বালকের মত সরল বিশ্বাস না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। বালকের ন্যায় বিশ্বাস দেখলে ঈশ্বরের দয়া হয়। যখন জমিদার নাবালক ছেলে রেখে মরে যায়, তখন অছি সেই নাবালকের ভার নেয়।

৬৪। নীচু হলে তবে উঁচু হওয়া যায়। চাতক পাখীর বাসা নীচে, কিন্তু ওঠে খুব উঁচুতে।

৬৫। যে সঙ্গের মধ্যে থাকবে, সেরূপ স্বভাব হয়; তাই ছবিতেও দোষ। সাধু-সন্ন্যাসীর পট ঘরে রাখা ভাল। সকাল-বেলা উঠে অন্য মুখ না দেখে সাধু-সন্ন্যাসীর মুখ দেখা ভাল। আর তা হলে ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়; যেমন শোলার আতা দেখলে সত্যকার আতার উদ্দীপন হয়।

৬৬। অসৎ লোক তোমায় কত নিন্দা করবে। তুমি যদি আন্তরিক ভগবানকে চাও, তুমি সব সহ্য করবে।

৬৭। অনেক খাটাখাটুনি, কিনা তপস্যার পর হার মেনে ভগবানকে, 'তোমার যা ইচ্ছা, তাই হোক'—বলে নিশ্চিন্ত হবার নাম নির্ভরতা।

৬৮। ভগবানের ওপর সর্বস্ব ভার দিয়ে যে নিশ্চিন্ত হতে পারে, তাকে বলে বিশ্বাসী।

৬৯। সালিসী, মোড়লী সব ছাড়। ও যারা করবে, তারা করুক। তুমি তাঁর পাদপদ্মে বেশী করে মন দাও। বলে—লঙ্কায় রাবণ মলো, বেহুলা কেঁদে আকুল হলো। কতকগুলি সংসারী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সঙ্গে রাতদিন বসে থাকা, আর তাদের খোসামোদ শোনা! তারা চায়—কিসে দু'পয়সা হয়। বিষয়ী লোকগুলোর পদার্থ নেই, যেন গোবরের ঝোড়া। দয়া, পরোপকার—ওসব যারা করবে, তাদের থাক্ আলাদা। আগে তিনি, তারপর দয়া, পরোপকার, জগতের উপকার, জীব-উদ্ধার। তোমার ও-ভাবনায় কাজ কি? প্রার্থনা কর,

যাতে সংসারের কাজ কমে যায়। ইচ্ছা করে বেশী কাজে জড়ান ভাল নয়।

৭০। মৃত্যুসময়ের জন্যে প্রস্তুত হওয়া ভাল। শেষ বয়সে নির্জনে গিয়ে কেবল ঈশ্বরচিন্তা ও তাঁর নাম করা উচিত। বয়স হলে সংসার থেকে চলে গিয়ে ঈশ্বরচিন্তা করা ভাল।

তীর্থকথা

১। কালীঘাট থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত পীঠস্থান। মা সবটা ব্যেপে আছেন।

২। কাশী, বৃন্দাবন—এই দু'টো হয়ে গেলেই হল।

৩। কাশী যাওয়ার কি দরকার, যদি ব্যাকুলতা না থাকে? ব্যাকুলতা থাকলে এখানেই কাশী।

৪। কাশীতে ব্রাহ্মণই মরুক, আর বেশ্যাই মরুক, শিব হবে।

৫। পুরীধামে যদি কেউ যাও তো টোটাগোপীনাথ দর্শন করো।

৬। দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী, কালীঘাটের কালী ও খড়দার শ্যামসুন্দর—এঁরা জ্যান্ত। কথা ক'ন, খেতে চান।

৭। গঙ্গা অভীষ্টদায়িনী, ইষ্টদর্শনের সহায়কারিণী।

৮। গঙ্গাজল স্পর্শ কর, ওতেই হবে। স্নান নাই বা করলে।

৯। যদি কেউ মা গঙ্গার কাছে অকপটে নিজের সব দুর্বলতার কথা জানায় তা হলে মা তার সব অপরাধ মার্জনা করেন।

১০। দশহরার দিন গঙ্গাপূজা করতে হয়।

১১। ব্রহ্মবারি গঙ্গাজল—জলের মধ্যে নয়—শ্রীবৃন্দাবনের রজ—ধূলার মধ্যে নয়, আর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ অন্নের মধ্যে নয়। এ তিন ব্রহ্মের স্বরূপ।

১২। খাওয়ার আগে ২।১ দানা মহাপ্রসাদ খেতে হয়।

১৩। যেখানে তাঁর কথা হয়, সেখানে তাঁর আবির্ভাব হয়, আর সকল তীর্থের আবির্ভাব হয়।

বিবিধ

১। দুষ্টলোকের মধ্যে থেকে কি আর ঈশ্বরলাভ হয় না? ঋষিরা বনের মধ্যে ঈশ্বরচিন্তা করত, চারদিকে বাঘ-ভাল্লুক।

২। এককে জানলে সব জানা যায়। একের পর যদি পঞ্চাশটা শূন্য থাকে তো অনেক হয়ে যায়। 'এক'কে পুঁছে ফেললে কিছুই থাকে না। 'এক'কে নিয়েই অনেক। এক আগে, তারপর অনেক। আগে ঈশ্বর, তারপর জগৎ।

৩। মনে নিবৃত্তি হলে বিবেক হয়। বিবেক হলে তত্ত্বকথা মনে ওঠে। শুদ্ধ মনে যা ওঠে, তা তাঁরই কথা। তিনিই মাহুৎ-নারায়ণ। তিনিই কর্তা। একটু 'আমি' যতক্ষণ রেখেছেন, তাঁর আদেশ শুনে কাজ করব।

৪। তাঁর সৃষ্টিই এই রকম—ভাল, মন্দ, সৎ, অসৎ। যেমন গাছের মধ্যে কোনটা আম গাছ, কোনটা কাঁঠাল গাছ, কোনটা আমড়া গাছ। দেখ না, দুষ্ট লোকেরও প্রয়োজন

আছে। যে তালুকের প্রজারা দুর্দান্ত, সে তালুকে একটা দুষ্ট লোককে পাঠাতে হয়, তবে তালুক শাসন হয়। তিনিই সুমতি দেন, তিনিই কুমতি দেন। পরমহংস দেখে—এসব মায়ার ঐশ্বর্য। নামরূপ যেখানে, সেখানেই প্রকৃতির ঐশ্বর্য। তাঁর মায়ার কাজে অনেক গোলমাল আছে ; এটির পর ওটি, এটি হতে ওটি হবে, এসব বলবার যো নেই। কিছু বোঝা যায় না।

৫। গোঁপে চাড়া, পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে আছেন, পান চিবুচ্ছেন, কোন ভাবনা নেই, এরূপ হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

৬। কামিনী-কাঞ্চনই মায়া। এর ভেতর বেশীদিন থাকলে হুঁশ চলে যায়, মনে হয় বেশ আছি। মেথর গুয়ের ভার বয়। বইতে বইতে আর তার ঘেন্না থাকে না।

৭। দয়া আর মায়া, এ দু'টি আলাদা জিনিস। মায়া মানে আত্মীয়ে মমতা, দয়া সর্বভূতে ভালবাসা, সমদৃষ্টি। কারু ভেতর যদি দয়া দেখ, যেমন বিদ্যাসাগরের, সে জানবে ঈশ্বরের দয়া। দয়া থেকে সর্বভূতের সেবা হয়। মায়াও ঈশ্বরের। মায়াদ্বারা আত্মীয়দের সেবা করিয়ে নেন। মায়াতে অজ্ঞান করে রাখে, বদ্ধ করে ; কিন্তু দয়াতে চিত্তশুদ্ধি হয়, ক্রমে মুক্তি হয়।

৮। সকলকে ভালবাসতে হয়, কেউ পর নয়। সর্বভূতে সেই হরিই আছেন। তিনি ছাড়া কিছু নেই।

৯। জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।

১০। শালগ্রাম হতে বড় মানুষ—নর-নারায়ণ।

১১। 'বজ্জাৎ আমি'তে দোষ হয়, বালকের 'আমি'তে কোন দোষ নেই। যেমন আর্শির মুখ, লোককে গালাগাল করে না। পোড়া-দড়ি, দেখতেই দড়ির আকার, ফুঁ দিলে উড়ে যায়।

১২। মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। এক পাশে পরিবার, একপাশে সন্তান; একজনকে একভাবে, সন্তানকে আর একভাবে আদর করে। কিন্তু দেখ, একই মন।

১৩। ঠিক ঠিক বৈরাগ্যে সব আছে। কিছুতেই অভাব নেই, অথচ সব মিথ্যাবোধ। বৈরাগ্যে একেবারে হয় না, তবু শুনে রাখা ভাল। শুনতে শুনতে বিষয়বাসনা একটু একটু করে কমে। বাসনা যেমন ভাঁড়ে ঘি—শুকিয়ে থাকে, লুকিয়ে থাকে। রোদ পেলে, বিষয়ের সঙ্গে সংযোগ হলে বেরিয়ে আসে।

১৪। মন্দাবৈরাগ্য—হচ্ছে, হবে—ঢিমেতেতালা। তীব্র-বৈরাগ্য শাণিত ক্ষুরের ধার, মায়াপাশ কচ্‌কচ্‌ করে কেটে দেয়।

১৫। বাগানে আম খেতে এসেছ—কত গাছ, কত কোটি পাতা, এসব হিসাবে কি দরকার? তাঁর কাজ কি কিছু বোঝা যায়? তিনি কেন সংহার করছেন, আমরা কি বুঝতে পারি?

১৬। সময় না হলে কি ত্যাগ হয়? ভোগান্ত হয়ে গেলে ত্যাগের সময় হয়। জোর করে কি কেউ ত্যাগ করতে পারে?

১৭। ভোগাসক্তি ত্যাগ হলে শরীর যাবার সময় ঈশ্বরকেই মনে পড়বে। তা না হলে এই সংসারের জিনিসই সব মনে পড়বে—স্ত্রীপুত্র, গৃহ, ধনমান, সম্ভ্রম ইত্যাদি।

১৮। অনুতাপাশ্রু চোখের কোণ দিয়ে আসে, আর প্রেমাশ্রু চোখের প্রান্ত দিয়ে গড়িয়ে আসে।

১৯। আচার যতটুকু দরকার, ততটুকু করবে। বেশী বাড়াবাড়ি করো না। কারু নিন্দা করো না, পোকাটিরও না।

২০। দেবস্বপ্ন সত্য। স্বপ্নসিদ্ধ যেই জনা, মুক্তি তার ঠাঁই।

২১। স্বপ্নে আগুনশিখা, সধবা মেয়ে, শ্মশানমশান, মশালের আলো দেখা ভাল।

২২। স্বপ্নে কেউ এসে পট্‌পট্‌ করে দীপ জ্বেলে দিয়ে গেল, কি আগুন লেগে গেল, কি নিজেই নিজের নাম ধরে ডাকলো—এসব খুব ভাল।

২৩। হারজিৎ তাঁর হাতে। তাঁর কাজ কিছু বোঝা যায় না। দেখ না, ডাব অত উঁচুতে থাকে, রোদ পায়; তবু ঠাণ্ডাশক্তি। এদিকে পানফল জলে থাকে—গরম গুণ।

২৪। শূকর-মাংস খেয়ে যদি ঈশ্বরে টান থাকে, তা হলে সে ধন্য। আর হবিষ্য করে যদি কামিনী-কাঞ্চনে মন থাকে তো সে ধিক্!

২৫। ডাক্তার, উকিল, মোক্তার, দালাল—এদের ঠিক ঠিক ধর্মলাভ হওয়া বড় কঠিন।

২৬। পাগল, মাতাল ও বালকবালিকাদের মুখ দিয়ে অনেক সময় দৈববাণী হয়।

২৭। যেদিন ভগবানের নাম হয় না, সেই দিনই খারাপ হয়।

২৮। রক্তের টানের চেয়ে ভক্তের টান বেশী।

২৯। যখন লোক দেখে লজ্জা হবে, তখন মনে করবি—লোক না পোক।

৩০। ভোগ ত্যাগ হয়ে গেলেই শান্তি। যেখানে ভোগ, সেখানেই ভাবনা-চিন্তা। যতক্ষণ চিলের মুখে মাছরূপ ভোগের বস্তু ছিল, ততক্ষণ কাকগুলো-রূপ ভাবনাচিন্তা হতে মুক্ত হতে পারে নি, ত্যাগ করে তবে শান্তি।

৩১। মূলো খেলে মূলোর ঢেকুর ওঠে। ভেতরের যার যা ভাব, কথাবার্তায় তা বেরিয়ে পড়ে।

৩২। জাগে তিন জন—যোগী, রোগী, ভোগী।

৩৩। উট কাঁটা ছেড়ে ভাল ঘাস পেলেও খাবে না। জানে কাঁটাঘাস খেলে মুখ কেটে রক্ত পড়বে, তবু তাই খাবে।

৩৪। রাতে কম খাবে, রাতের খাওয়া তো জলখাবার।

৩৫। আত্মহত্যা মহাপাপ, ফিরে ফিরে সংসারে আসতে হবে। তবে যদি ঈশ্বরের দর্শন হয়ে কেউ শরীর ত্যাগ করে, তাকে আত্মহত্যা বলে না।

৩৬। দুষ্ট লোকের কাছে ফোঁস করতে হয়, ভয় দেখাতে হয়, পাছে অনিষ্ট করে। তাদের গায়ে বিষ ঢালতে নেই, অনিষ্ট করতে নেই। (ব্রহ্মচারী ও সাপের গল্প)।

৩৭। খুব সাবধানে থাকতে হয়, এমন কি কাপড়-চোপড়েও অহঙ্কার হয়। পিলেরোগী, কালাপাড় কাপড় পরেছে, অমনি

নিধুবাবুর টপ্পা গাইছে। সামান্য আধার হলে গেরুয়া পরলে অহঙ্কার হয়।

৩৮। শ্রাদ্ধের অন্ন খেও না। অসৎ লোককে খাওয়াতে নেই।

৩৯। জন্ম, মৃত্যু ঈশ্বরের অধীন।

৪০। অন্নচিন্তা চমৎকারা।
কালিদাস হয় বুদ্ধিহারা।

৪১। কলিতে অন্নগতপ্রাণ, যার তার অন্ন খেতে নেই, স্পর্শদোষ আসে।

৪২। পুরুষের পদ্মপত্রের মত চোখ হলে অন্তরে সদ্ভাব ও সাধু ভাব থাকে। দেবচক্ষু বেশী বড় হয় না, কিন্তু আকর্ণ টানা। ষাঁড়ের মত চোখ হলে কাম প্রবল হয়। কতকগুলো খারাপ লক্ষণ আছে ঃ হাতভারি, বেঁটে, ডোব কাটা কাটা গা, কানা, নাক-টেপা, টেরা, চোখ-কোটর, উন-পাঁজর, হাড়-পেকে, বাছুরে-গাল, বিড়াল-চোখ, মুখ থ্যাবড়ান, পুরুষাঙ্গের চামড়া কাটা, মোটা ঠোঁট, কনুইএর গাঁট মোটা। তাদের বিশ্বাস সহজে হয় না। বরং এক-চোখ ভাল তো টেরা ভাল নয়, ভারি দুষ্ট ও খল হয়। লক্ষণ মানতে হয়।

৪৩। জীবের অহঙ্কার আছে বলে ঈশ্বরকে দেখতে পায় না। মেঘ উঠলে আর সূর্য দেখা যায় না; কিন্তু দেখা যাচ্ছে না বলে কি সূর্য নেই? সূর্য ঠিক আছে।

৪৪। মুখ হলসা, ভেতরবুঁদে, কানতুলসে,
দীঘল-ঘোমটা-নারী।
পানাপুকুরের শীতল জল বড় মন্দকারী॥

৪৫। বড়লোক, কুকুর, মাতাল, ষাঁড়—এ ক'টি হতে সাবধান হতে হয়। এরা তোমার মন্দ করতে পারে। মাতালকে বলতে হয়, "কি খুড়ো, কেমন আছ?"

৪৬। হনুমান বলতেন, 'আমি বার-তিথি-নক্ষত্র—এসব জানি নে, কেবল এক রামচিন্তা করি।'

৪৭। বাপ-মাকে, বড় ভাইকে খুব ভক্তি করবি, কিন্তু ঈশ্বরের পথে বাধা দিলে মানবি নি। খুব রোক আনবি—শালার বাপ। ঈশ্বরের জন্যে গুরুজনের বাক্য লঙ্ঘনে দোষ নেই। (উদাহরণ—প্রহ্লাদ, বলী, বিভীষণ, ভরত, গোপীগণ।)

৪৮। মা-বাপ প্রসন্ন না হলে ধর্ম-টর্ম কিছুই হয় না।

৪৯। যে ঈশ্বরের পথে বিঘ্ন করে এমন স্ত্রী ত্যাগ করবে, আত্মহত্যাই করুক, আর যাই করুক। যে ঈশ্বরের পথে বিঘ্ন দেয় সে অবিদ্যা-স্ত্রী। কিন্তু যার ঈশ্বরে আন্তরিক ভক্তি আছে, তার সকলেই বশে আসে—রাজা, দুষ্ট লোক, স্ত্রী!

৫০। যারা অতি নীচুঘর, তারাই ঈশ্বরকে রোগ ভালর জন্যে প্রার্থনা করে।

৫১। রোগের ভোগই ভাল।

৫২। শ-ষ-স—সহ্য কর, সহ্য কর, সহ্য কর। যে সয়, সে রয়, যে না সয়, সে নাশ হয়।

৫৩। দেহ জানে, আর দুঃখ জানে—মন তুমি আনন্দে থাক। মন যেখেনে, তুমিও সেখেনে।

৫৪। অন্নদান চেয়ে জ্ঞানদান, ভক্তিদান আরো বড়।

৫৫। একাদশী করা ভাল, ওতে মন পবিত্র হয় ও ঈশ্বরে ভক্তি হয়।

৫৬। যার কেউ নেই, তারই ভগবান আছেন। ঠিক লোকের তিনি কখনো কোথাও অপমান করান না।

৫৭। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় শাস্ত্রে আছে—বলি দেওয়া যেতে পারে। বিধিবাদীয় বলিতে দোষ নেই—যেমন অষ্টমীতে একটি পাঁঠা। কিন্তু সকল অবস্থায় হয় না।

অবস্থাবিশেষে দেখা যায়, সর্বভূতে ঈশ্বর। পিঁপড়েতেও তিনি। এ অবস্থায় হঠাৎ কোন প্রাণী মারলে এই সান্ত্বনা হয় যে, তার দেহমাত্র বিনাশ হল, আত্মার জন্ম-মৃত্যু নেই।

৫৮। পাপ তুলোর পাহাড়। পাহাড় প্রমাণ তুলো যেমন একটু অগ্নি-স্ফুলিঙ্গে অচিরে ভস্মীভূত হয়, তেমনি ভগবানের কৃপাকণা পেলে পাহাড় প্রমাণ পাপও চকিতে ধ্বংস হয়ে যায়।

৫৯। খাবে গরম, শোবে নরম।

৬০। ভক্ত হবি বলে বোকা হবি কেন?

শেষকথা

১। এখানে যারা আসবে, তাদের শেষ জন্ম। যে আন্তরিক ঈশ্বরকে ডাকবে, তার এখানে আসতেই হবে। যারা অন্তরঙ্গ, তারা কেবল এখানেই আসবে। তারা পরস্পর সব আত্মীয়—যেমন ভাই ভাই।

২। এখানে যারা যারা আসবে, সকলের সংশয় মিটে যাবে। যারা যারা এখানে আসে, তাদের সংস্কার আছে।

৩। যে আন্তরিক ঈশ্বরকে ডেকেছে বা সন্ধ্যা-আহ্নিক করেছে তার এখানে আসতেই হবে। তার একেবারে চৈতন্য হবে। তার মালা জপ অত করতে হবে না।

৪। জ্ঞান জন্মালেই তার শেষ জন্ম। ভগবানের নামে যার প্রেমোদয় হয়, তাঁর নামে যার শরীর কণ্টকিত হয়, তাঁর নাম করতে করতে যার ধারা বয়ে যায়, তাকে আর জন্মাতে হয় না, সেটি তার শেষ জন্ম।

৫। যার সাধন করবার শক্তি নেই—যার কোন সাধনমতে প্রবেশ করবার উপায় নেই—এমন উপায়হীন, পতিত, নিরাশ্রয় নরনারী যারা আছে, তারা যদি আমাকে ব-কলমা দেয় তো তাদের পরিত্রাণের ভার আমার। (তাদের) আমার প্রতি মন রাখলেই যথেষ্ট হবে।

৬। যার শেষ জন্ম, সে এই ঘরে আসবে। যাদের ধর্ম সম্বন্ধে কিছু হবার, তাদের এখানকার হাবভাব সমস্ত ভাল লাগবে।

শ্রীশ্রীমার কথা

১। ঠাকুরই সব। তিনিই গুরু, তিনিই ইষ্ট। তাঁর মাঝে গুরু ইষ্ট সব পারে। তিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি। তিনি সর্ব দেবময়, সর্ব বীজময়। তিনি পূর্ণব্রহ্মসনাতন।

২। ঠাকুর ও আমাকে অভেদভাবে দেখবে। জানবে যে ঠাকুর আর আমি এক। যখন একজনের পূজা কর, তখন আর একজনেরও পূজা হয়ে যায়।

৩। যে ঠাকুর, সেই মা—এই জেনে জপধ্যান করবে।

৪। জপধ্যান করতে করতে দেখবে, ঠাকুর কথা কবেন, সব বাসনা পূর্ণ করে দেবেন, প্রাণে শান্তি আসবে।

৫। যে ঠাকুরকে চিন্তা করবে, তার কখনো খাওয়ার কষ্ট হয় না। যে ব্যাকুল হয়ে ডাকবে, সেই তার দেখা পাবে।

৬। ডাকতে ডাকতে ছবিতে তাঁর আবির্ভাব হয়। ধ্যান নাই বা হল, ঠাকুরের ছবি দেখলেই হবে। তাঁকে দেখবে, তা হলেই হবে।

৭। ঠাকুরে ভক্তিশ্রদ্ধা বিশ্বাস করলেই, তাঁর নাম জপ, তাঁর লীলা ধ্যান করলেই কুণ্ডলিনী আনন্দে আপনি জেগে উঠবেন। এতটুকু কঠোরতা করতে হবে না।

৮। ঠাকুরকে সর্বদা আপন জ্ঞান করবে। আমাকে আপন মা জ্ঞান করবে; সকল বিষয়ে আমাদের ওপর নির্ভর করবে।

৯। তাঁর ত্যাগই ছিল ঐশ্বর্য। শ্রীগুরুদেব ছিলেন অদ্বৈতময়। তিনি অদ্বৈতবাদই প্রচার করেছিলেন। তাঁর সন্তানরা সকলেই অদ্বৈতবাদী।

১০। আমাকে যে জগন্মাতা ভাববে, তার পূর্ণ জ্ঞান।

১১। মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্যে (ঠাকুর) আমাকে এবার রেখে গেছেন।

১২। যে যার সে তার, যুগে যুগে অবতার।

১৩। দুপুরের পূর্বেই জপ সারবে। জপই তাঁর ভোজ্য, ভালবাসাই তাঁর পূজার নৈবেদ্য।

১৪। ঠাকুরকে তিন তরকারির কম ভোগ দেবে না। তিনি সর, নারকেল নাড়ু, ডুমুর, কাঁচাকলা, গাঁদাল ঝোল, শুক্ত ভালবাসতেন। অন্তত: শনি, মঙ্গলবারে মাছ ভোগ দেবে।

১৫। নাম জপতে জপতে ইন্দ্রিয়গুলোর অনিষ্টশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। ধ্যানজপ, ঈশ্বরচিন্তা ও সৎকাজ করলে পাপ কেটে যায়। ইষ্টে যার সর্বদা মন থাকে, তার কখন অনিষ্ট হয় না।

১৬। সন্ধিক্ষণেই তাঁকে ডাকা প্রশস্ত। রাত যাচ্ছে, দিন আসছে, দিন যাচ্ছে, রাত আসছে—এই হল সন্ধি। এই সময় মন পবিত্র থাকে।

১৭। মন না বসলেও জপ ছাড়বে না। তোমার কাজ তুমি করে যাবে। জপে সংখ্যা রাখার দরকার নেই, তা হলে সংখ্যার দিক লক্ষ্য থাকে। নাম করতে করতে মন আপনি স্থির হবে। যে দিন ধ্যান হবে না, সে দিন অমনি প্রণাম করেই উঠবে।

১৮। মন স্থির করে একবার ডাকলে লক্ষ জপের কাজ হয়, নতুবা সারাদিন জপ করছে, কিন্তু মন নেই; তাতে ফল কি? মন চাই, তবে তাঁর কৃপা।

১৯। সাধন মানে তাঁর পাদপদ্ম সর্বদা মনে রেখে তাঁর চিন্তায় মনকে ডুবিয়ে রাখা।

২০। ভক্তিভাবে পুষ্পাঞ্জলি দিলেই তাঁর পূজা হয়ে যাবে।

২১। মন্ত্রের ভেতর দিয়ে শক্তি শিষ্যে যায়। শিষ্যের পাপ গুরুতে আসে। তাই তো এ-শরীরে এত ব্যাধি হয়।

২২। সকল অবস্থায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর নাম কর।

২৩। যে তাঁর ওপর নির্ভর করে, তিনি তাকে সকল বিপদ হতে রক্ষা করেন।

২৪। সর্বদাই গীতাখানা একটু পাঠ করো, ঠাকুরের কথামৃত আর রামকৃষ্ণ-পুঁথিখানা পড়ো। আরও ঠাকুরের কত বই বের হয়েছে, ঐ সব পড়বে।

২৫। নির্বাসনা এবং ভগবানে ভালবাসা না হলে ধ্যান হওয়া বড় কঠিন।

২৬। অপ্রসাদী অন্ন খেতে নেই। যেমন অন্ন খাবে, তেমন রক্ত হবে। শুদ্ধ অন্ন খেলে, শুদ্ধ রক্ত হয়, শুদ্ধ মন হয়, বল হয়। শুদ্ধ মনে ভক্তি হয়, প্রেম হয়। প্রসাদ খেলে চিত্তশুদ্ধি হয়।

২৭। প্রসাদ কোন বস্তুর মধ্যে নয়। প্রসাদে ও হরিতে কোন প্রভেদ নেই—মনে এটি স্থির বিশ্বাস রেখো।

২৮। মনেতেই সব। মনেতেই শুদ্ধ, মনেতেই অশুদ্ধ। অনেক সাধনা করলে, পূর্বজন্মের অনেক তপস্যা থাকলে তবে এজন্মে মনটি শুদ্ধ হয়। যার শুদ্ধ মন, সে সব শুদ্ধ দেখে।

২৯। তীর্থভ্রমণ খুব ভাল। ওতে মন পবিত্র হয়।

৩০। মন যদি একস্থানে শান্তিতে থাকে, তবে তীর্থভ্রমণের কি দরকার?

৩১। কাশীপুর বাগান তাঁর অন্ত্যলীলার স্থান। কত তপস্যা, ধ্যান, সমাধি! তাঁর মহাসমাধির স্থান—সিদ্ধস্থান। ওখানে ধ্যান করলে সিদ্ধ হয়।

৩২। ঠাকুরের জন্মস্থান পুণ্যস্থান, মহাপীঠস্থান—তীর্থভূমি।

৩৩। ভুবনেশ্বর হরিহর—অর্ধাংশ হরি-জগন্নাথ। অপর অর্ধেক হর-মহেশ্বর।

৩৪। কাশীর কেদারনাথের সঙ্গে হিমালয়ের কেদারের যোগ আছে। কাশীতে দর্শন হলেই, হিমালয়ের কেদার দর্শন হয়ে যায়।

৩৫। যারা গঙ্গাতীরে বাস করে, তারা দেবতা।

৩৬। ব্যাধি ও তপস্যা একই জিনিস। তপস্যার মত ব্যাধিতেও কর্ম ক্ষয় হয়। কর্ম করতে করতে কর্মের বন্ধন কেটে যায়, তবে নিষ্কাম ভাব আসে। কর্মক্ষয় ধীরে ধীরে হয়।

৩৭। দুঃখ তো তাঁর দয়ার দান। তিনি যত দুঃখ-কষ্ট দিচ্ছেন, তা তো বুক পেতে নিতে হবে।

৩৮। গুরু ও ঈশ্বরের সাহায্য না পেলে কি কেউ আপনি বন্ধন খুলতে পারে? তাই ঠাকুর অতি কঠোর তপস্যা করে তার ফল, যে সব ভক্ত আসবে তাদের জন্যে, সঞ্চয় করে রেখে গেলেন। তিনি তো কৃপা করে দরজায় দাঁড়িয়ে, এখন তুমি দরজা খুললেই হয়।

৩৯। এমন যে জল, যার স্বভাবই নীচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে; তেমনি মনের তো স্বভাবই নীচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

৪০। যেমন ঝড়ে মেঘ উড়িয়ে নিয়ে যায়, তেমনি তাঁর নামে বিষয়মেঘ কেটে যাবে।

৪১। দেহ একটি, দেহী একটি। দেহী সব শরীর জুড়ে রয়েছেন, তাই পায়ে ব্যথা।

৪২। গৃহীদের বহিঃসন্ন্যাস দরকার নেই, তাদের অন্তঃসন্ন্যাস আপনা হতে হবে। অন্তর-সন্ন্যাস—যেমন নারদের; ভেতরে গেরুয়া, বাইরে সাধারণ মানুষের মত।

৪৩। দুঃখপূর্ণই এই জগৎ। সুখ কেবল একটি নামমাত্র। ঠাকুরের কৃপা যার ওপর হয়েছে, সেই কেবল তাঁকে ভগবান বলে জানতে পেরেছে—আর তার সেইটুকুই সুখ।

৪৪। কর্মফল ভুগতে হবেই, তবে ঈশ্বরের নাম করলে যেখানে ফাল সেঁধুতো, সেখানে ছুঁচ ফুটবে। প্রারব্ধের ভোগ ভুগতেই হবে, তবে ভগবানের নাম করলে এই হয়—যেখানে একজনের পা কেটে যাবার কথা ছিল, সেখানে একটা কাঁটা ফুটে ভোগ হল। ঈশ্বরের শরণাগত হলে তাঁর নিজের কলম নিজ হাতে কাটাতে হয়। কর্ম শেষ হলেই ভগবান দর্শন হয়, সেইটি শেষ জন্ম।

৪৫। যে জন্মে মন বাসনাশূন্য হয়, সেইটি শেষ জন্ম। ভোগোন্মুখ ও ক্ষয়োন্মুখ বাসনা বহির্দৃষ্টিতে সমান দেখালেও কার্যত সমান নয়। বাসনাই সকল দুঃখের মূল। বাসনা থাকলে পুনর্জন্ম হবেই। সবাই কি নির্বাসনা হতে পারে? তা পারলে তো সৃষ্টি ফুরিয়ে যেত, পারে না বলেই তো সৃষ্টি চলছে, পুনঃ পুনঃ জন্মাচ্ছে। বাসনাশূন্য দুই একটিরই মুক্তি হয়। নির্বাসনাই প্রার্থনা করতে হয়, কারণ বাসনাই বার বার জন্ম-মৃত্যুর কারণ, আর মুক্তিপথের অন্তরায়।

৪৬। মনের বাসনা-কামনা যা আছে, পূরণ করে নাও, পরে রামকৃষ্ণলোকে গিয়ে চিরশান্তি ভোগ করবে।

৪৭। যার ওপর যেমন কর্তব্য করে যাবে, কিন্তু ভাল এক ভগবান ছাড়া আর কাউকে বেসো না। ভালবাসলে অনেক দুঃখ পেতে হয়।

৪৮। যারা আমার ছেলে, তাদের মুক্তি হয়ে রয়েছে। স্মরণ রেখ যে, তোমাদের পেছনে এমন একজন রয়েছেন, যিনি সময় আস্‌লে তোমাদের সেই নিত্যধামে নিয়ে যাবেন। এটুকু মনে রাখলেই হল—আমার একজন দেখবার আছেন, আমার একজন মা কি বাবা আছেন। একটি গণ্ডির মধ্যে তোমাদের ঘুরতেই হবে, অন্য কোথাও যাওয়ার যো নেই।

৪৯। তিনি সর্বদা তোমাদের রক্ষা করছেন। সংসারে যেমন মা-বাপ ছেলেদের আশ্রয়স্থল, তেমনি ঠাকুরকে জ্ঞান করবে।

৫০। ভয় কি বাবা, সর্বদার তরে জানবে যে ঠাকুর তোমাদের পেছনে রয়েছেন, আমি রয়েছি! আমি মা থাকতে ভয় কি? আমার ছেলে যদি ধুলো কাদা মাখে, আমাকেই তো ধুলো ঝেড়ে কোলে নিতে হবে!

৫১। ভগবান লাভ হলে মন শুদ্ধ হয়, শুদ্ধ মনে জ্ঞান-চৈতন্য লাভ। ভগবান লাভ হলে অন্য কিছু হয় না, ভেতরে ভেতরে তিনি জ্ঞানচৈতন্য দেন—নিজে তা জানতে পারে।

৫২। আমাকে ধ্যান করলেই হবে। ঠাকুর আর আমি অভেদ।

স্বামী শিবানন্দজী

শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের কথা

১। শ্রীরামকৃষ্ণের শরণ নিলে তার পরিত্রাণের আর ভাবনা নেই, নিশ্চয় জানবে। যে তাঁর আশ্রয় এক মুহূর্তের জন্য সমস্ত প্রাণের সঙ্গে গ্রহণ করেছে, সে তাঁকে ছাড়তে চেলেও, তিনি তাকে ছাড়বেন না—এ নিশ্চিত জেনো।

২। ভগবানের কোন ভাবই মন্দ নয়, এই-ই প্রভু রামকৃষ্ণের ভাব। সমস্ত ভাবের জমাটবাঁধা শ্রীরামকৃষ্ণ।

৩। প্রভু তাঁর দিব্যধামে দিব্যশরীরে সর্বদাই বর্তমান আছেন। মহারাজ ও তাঁর অন্যান্য ভক্তগণ যাঁরা স্থূলদেহ ত্যাগ করে গেছেন, সকলেই সেই দিব্যধামে, দিব্যশরীরে সর্বদাই বর্তমান আছেন, এতে আর কোন সন্দেহ নেই।

৪। সেই মা কালীই ঠাকুররূপে এসেছিলেন। স্বয়ং আদ্যাশক্তি, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আধারভূতা সেই জগজ্জননী স্বয়ং ঠাকুরের দেহ আশ্রয় করে লীলা করেছেন।

৫। 'রামকৃষ্ণ' এ-যুগের ডঙ্কামারা নাম, মহামন্ত্র। সব সময়—চলতে ফিরতে, খেতে শুতে, স্বপনে জাগরণে, সর্বাবস্থায়ই জপ করা চলে। এ যুগে ঠাকুরের নাম করলেই মুক্তি। এ যুগে মা 'রামকৃষ্ণ' নামে অধিক প্রসন্না।

৬। প্রভুর লীলাস্থল দক্ষিণেশ্বর—আমাদের কৈলাস, আমাদের কাশী, আমাদের বৈকুণ্ঠ, আমাদের গোলোক,

জারুজালেম। পঞ্চবটী মহাসিদ্ধ পীঠ। দক্ষিণেশ্বরের প্রতি ধূলিকণা পবিত্র। স্বয়ং শ্রীভগবানের পাদস্পর্শে দক্ষিণেশ্বর মহাতীর্থে পরিণত হয়েছে! এখানে সকল তীর্থের সমাবেশ। দক্ষিণেশ্বর তীর্থরাজ।

৭। ঠাকুর ত সব জায়গায় আছেন, কিন্তু মঠে (বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ) তাঁর বিশেষ প্রকাশ। বেলুড়মঠে ঠাকুর সাক্ষাৎ বিরাজ করেন। তাঁর ছবি শুধু ছবি মাত্র নয়, তিনি ছবিতেও আছেন। বেলুড়মঠ এ যুগের মহাতীর্থ, সাক্ষাৎ কৈলাসপুরী। সমস্ত সংঘের মাথা।

৮। বহুলোকের কল্যাণের জন্যে ভগবান, যিনি পরব্রহ্ম, তিনি এই রামকৃষ্ণ-রূপ ধরে এ যুগে এসেছেন। তুমি যখন সেই যুগাবতারের আশ্রয়ে এসেছ, তখন ভাবনা কি?

৯। শ্রীরামকৃষ্ণ-নাম ও শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপই তাঁর সেই নামরূপাতীত শান্তিময় অবস্থায় নিয়ে যায়। নাম রূপের পারেই তো যেতে হবে।

১০। ঠাকুরই দুর্গা, ঠাকুরই কালী, ঠাকুরই রাম, কৃষ্ণ, শিব; আবার ঠাকুরই সেই নির্বিশেষ শুদ্ধ চৈতন্য।

১১। প্রভু জগতে এসেছেন, যে রূপেই হোক, জগতের কল্যাণ হবে। তিনি আমাদের দয়া ও প্রেমের ঠাকুর। প্রেমই তাঁর কল্যাণ-রূপের প্রকাশ ভাব।

১২। আমরা জানি যে ঠাকুরই স্বয়ং সনাতন ব্রহ্ম।

১৩। জগদম্বার জীবন্ত বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণকে ঠিক ঠিক জানা হলেই সব জানা পাওয়ার শেষ হবে।

১৪। প্রভুই এ যুগে সত্য অবতার, সত্য যুগধর্মসংস্থাপক, যুগাচার্য। তিনি সর্বদেবীর সমষ্টি। তিনি পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ।

১৫। সনাতন বৈদিক ধর্ম লোপ হয়ে গেলে জগতের আধ্যাত্মিকতাই নষ্ট হয়ে যাবে, তাই সনাতন ধর্মকে রক্ষা করতে ভগবান অবতীর্ণ হলেন রামকৃষ্ণরূপে। ঈশ্বর-অবতারের কাজে অসম্ভব সম্ভব হয়।

১৬। তাঁর মধুর জীবন্ত মূর্তিই জীবের ধ্যেয়, তাঁর পবিত্র চরিত্র পাঠ ও আলোচনাই শাস্ত্রাধ্যয়ন, তাঁর নামগুণ গান করাই কীর্তন ও তাঁর ভক্তসঙ্গই সাধুসঙ্গ।

১৭। আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে, যিনি শ্রীরামকৃষ্ণচরণে আশ্রয় নিয়েছেন, তাঁর এ ভবসাগর পার হবার আর চিন্তা নেই। তাঁর শ্রীচরণে কাতরে প্রার্থনা করলে মনের সব অজ্ঞানতা দগ্ধ হয়ে যায়। 'বালানাং রোদনং বলম্'। যে কাতরে প্রার্থনা করবে, তাকেই তিনি দয়া করে থাকেন। ভক্তি হলে মুক্তি-টুক্তি সব হয়।

১৮। 'যার শেষ জন্ম, সে এই ঘরে আসবে'—এর অর্থ, যে কায়মনোবাক্যে অন্তরের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্বে বিশ্বাস করে, সেই তাঁর ঘরে আসে, তারই শেষ জন্ম। তার বিশ্বাস, ভক্তি, জ্ঞান, মুক্তির কোন অভাব হবে না—আমি খুব জোরের সঙ্গে একথা বলছি। যদি কোন ভক্তের দীক্ষা বা সন্ন্যাস গ্রহণের পর অসদাচার দৃষ্টিগোচর হয়, আপাতদৃষ্টিতে তা খুব খারাপ। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, যদি ঠিক ঠিক শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্বে সে বিশ্বাস করে থাকে, তা হলে

কোন সময় তার অনুতাপ আসবেই আসবে। যদি অনুতাপ দুর্ভাগ্যবশত না আসে, তবে জানতে হবে যে, তার পূর্বোক্ত বিশ্বাস নেই, এবং শেষ জন্মও নয়।

১৯। আমাদের মা যে-সে মেয়ে নয়। জগতের কল্যাণের জন্যে, জীবকে মুক্তি দেবার জন্যে স্বয়ং জগজ্জননী লীলাদেহ ধারণ করে এসেছিলেন।

২০। আমাদের মায়ের নাম সারদা, মা-ই স্বয়ং সরস্বতী।

২১। শ্রীশ্রীমা ছিলেন দশমহাবিদ্যার একজন।

২২। শ্রীশ্রীদক্ষিণা কালিকার ধ্যানে মার পূজা করবে। ঠাকুরের ছবির পাশেই শ্রীশ্রীমার ছবি রাখবে।

২৩। শ্রীশ্রীমা মহামায়াও বটে, মায়ামোচন করেনও বটে।

২৪। মা সম্বন্ধ বড়ই মধুর ও খুব পবিত্র।

২৫। ঠাকুর আমায় একদিন বলেছিলেন, "ঐ মন্দিরের মা আর এই নহবতের মা এক, অভেদ।"

২৬। তোমরা ঠাকুরকে দেখনি, কিন্তু আমাদের দেখছ, আমাদের মুখে তাঁর কথা শুনতে পাচ্ছ, এ কম সৌভাগ্যের কথা নয়! তোমরা খুবই fortunate (ভাগ্যবান), জগতের কোটি কোটি নরনারীর চেয়ে বেশী ভাগ্যবান।

২৭। ঠাকুরের অন্তরঙ্গদের কাউকে যে ভালবাসা ও ভক্তি, তা ঠাকুরে গিয়েই পৌঁছবে। আমরা তো ঠাকুর বৈ আর কিছু জানিনে। অন্তর-বা'র জুড়ে তিনিই রয়েছেন। আমাদের ভাবলে তাঁকেই ভাবা হবে।

২৮। ঠাকুরের চরণে যারা অনন্যশরণ হয়েছে, যাদের

আমরা আশ্রয় দিয়েছি, তাদের মুক্তির ভাবনা নেই। মুক্তি তাদের হয়ে যাবে। সে ভার আমাদের ওপর, আমরা তা বুঝে নেব। তোমার ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সব জেনেই তিনি কৃপা করেছেন। তাঁর সন্তানরা—যাঁদের কৃপা করেছেন, তাদের মুক্তি নিশ্চিত। আমরা যাদের ভার নিয়েছি, তাদের ইহ-পরকালের ভার আমাদের নিতে হয়েছে। তাদের আর ভয় নেই, জাত সাপে ছুঁয়েছে, তাদের সব হবে।

২৯। এর ভেতর ঠাকুর ছাড়া আর কিছু নেই। তিনি যেমন করাচ্ছেন, তেমনি করছি—যেমন বলাচ্ছেন, তেমনি বলি। আমার হৃদয়সর্বস্ব-ধন হলেন—প্রভু রামকৃষ্ণ। তুমি এই আধারকে যতই ভালবাসবে, তা প্রভুতেই পৌঁছুবে।

৩০। ঠাকুর যখন এ শরীর দ্বারা তোমাদের তাঁর পাদপদ্মে আশ্রয় দিয়েছেন, তখন তোমাদের কোন চিন্তা নেই। ঠাকুরের আশ্রিত ভক্তদের মুক্তি নিশ্চয়। তিনিই একমাত্র জগৎগুরু এযুগে।

৩১। ঠাকুরকে ও আমাদের নিত্য অন্তত একবার স্মরণ করবে শত কাজের মধ্যেও, তা হলেই হয়ে যাবে।

৩২। আমার ওপর প্রীতিটা খুব ঘন থাকলেই হল, আর বড় বেশী কিছু করতে হবে না। আমাতে বিশ্বাস থাকলে তোমার সব হবে। আমাকে ভালবাসলেই হবে, একে (নিজ দেহ দেখিয়ে) মনে করলেই হবে।

৩৩। আমার মধ্যে আমি নেই, শ্রীশ্রীঠাকুরই জাগ্রত ও জীবন্ত হয়ে আছেন। আমাদের মুখ দিয়ে তিনি যা বলেন, তা বিশ্বাস কর ; পূর্ণ হয়ে যাবে।

৩৪। এখান থেকে এখন যে সব কথা বেরুচ্ছে, সে সব ঠাকুরেরই কথা বলে জানবি। এখন ঠাকুরের সঙ্গে এক হয়ে রয়েছি।

৩৫। আমাকে জানলেই তাঁকে জানা হল, কারণ তাঁর সত্তা আমাদের ভেতর রয়েছে যে! আমরা তাঁরই অংশ।

৩৬। মা আমায় কৃপা করে সব দিয়েছেন। আমার তাঁর কাছে চাইবার কিছুই নেই, তাঁর কৃপায় আমার সব লাভ হয়েছে। আমি ব্রহ্মানন্দ-স্বরূপ। নামরূপ—এসব নিম্নস্তরের ব্যাপার। নামরূপের ওপরে মন গেলেই—ব্যস্, সবই তখন চৈতন্যময়। আমাদের ওপর মানুষবুদ্ধি এলেই মরে যাবি।

৩৭। আমি শাশ্বত চিরমুক্ত আত্মা, ঠাকুর সনাতন আদি-কারণ ঈশ্বর, জগতের কল্যাণের জন্যে নরদেহে অবতীর্ণ সাক্ষাৎ যুগাবতার।

৩৮। মুক্তশরীর কিনা, তাই এটার (নিজের শরীর দেখিয়ে) চিন্তা করলে মুক্ত হয়ে যায়। সন্ন্যাসী তো শিবস্বরূপ!

৩৯। তাঁর যে প্রিয়, সে যে আমাদেরও অতি প্রিয়। তোমাদের এত স্নেহ করি, ভালবাসি—তোমরা তাঁর ভক্ত বলেই, অন্য কিছুর জন্যে নয়।

৪০। তিনি যে ভগবান, তা কি আমরাই প্রথমটায় ঠিক ঠিক ধরতে পেরেছিলাম? তিনি সাক্ষাৎ দেবাদিদেব জগন্নাথ, তা পরে বুঝতে পেরেছি। তাঁর ঠিক ঠিক স্বরূপ তিনি কৃপা করে জানিয়ে দিয়েছেন।

৪১। গুরু তোমার হৃদয়-মন্দিরেই চিরপ্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। স্থূল দেহনাশে গুরুর নাশ হয় না।

৪২। মানুষ কখনও গুরু হতে পারে না। যখন কোন সদ্‌গুরু শিষ্যকে দীক্ষা দেন, তখন স্বয়ং ভগবানই গুরু-হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে শিষ্যের প্রাণে শক্তিসঞ্চার করেন। গুরু, ইষ্ট একই। তিনিই তো গুরুরূপে আমার হৃদয়ে বসে ভক্তদের কৃপা করছেন। গুরু বদলাতে নেই। গুরুবরণ হয়ে গেলে আর জন্ম হয় না।

৪৩। গুরুকে দ্বারমে কুত্তেকে মাফিক পড়ে রহো। কুকুরের মত আমাদের প্রভুর দ্বারে একনিষ্ঠভাবে, তাঁর শরণাগত হয়ে পড়ে থাকতে হবে। যে শেষ পর্যন্ত তাঁর আশ্রয়ে পড়ে থাকতে পারবে, তার হয়ে যাবে। প্রকৃত শরণাপন্ন ভক্তের ভয় নেই, তাদের প্রভু বিপথ হতে রক্ষা করে ঠিক পথে এনে দেবেন।

৪৪। মন্ত্র, গুরু ও ইষ্ট—এই তিন এক। সচ্চিদানন্দই একমাত্র গুরু।

৪৫। মন্ত্র সিদ্ধগুরুর মুখ থেকে বেরুলে তাতে মন্ত্রচেতন হয়; নইলে তো ওটা শব্দমাত্র। গুরু নিজ শক্তিবলে মন্ত্র-চৈতন্য করে দেন।

৪৬। বীজ ও নাম অভেদ। নাম যাঁর, বীজও তাঁর। বীজ ও নাম একই।

৪৭। ঠাকুরকেও আমাদের যতই আপনার বোধ হবে, ততই ধ্যান জপ আপনা-আপনি হয়ে যাবে।

৪৮। জপের দ্বারা কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ হয়। জাগরণের লক্ষণ জপে আনন্দ হওয়া।

৪৯। শ্রীশ্রীঠাকুরের মূর্তি সম্মুখে রেখে তাঁর প্রতি চেয়ে তাঁর চিন্তা করলে নিশ্চয়ই ধ্যান হবে। তাঁর মূর্তি চিন্তা করলেই সব হবে।

৫০। মনকে স্থির করার একমাত্র প্রধান ও সহজ উপায় এই : শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমূর্তির সামনে বসে, তাঁর দিকে দৃষ্টি রেখে, তাঁর নাম জপ করা ও মনে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে, ঠাকুর তোমার দিকে দেখছেন, তোমার জপ শুনছেন ও তোমাকে কৃপা করবার জন্যে বসে আছেন। তিনি পরম দয়াল, ভক্তের পরমাত্মীয়, প্রাণের প্রাণ। তিনিই পিতা, তিনিই মাতা, তিনিই জীবনসর্বস্ব।

৫১। দ্রুত জপ না করে ধীরে ধীরে তাঁর নাম নিলে হৃদয়ে আনন্দ ও প্রেমানুভব অধিক হয়, সংখ্যা অধিক হোক আর না হোক। সংখ্যার দিকে অত নজর রাখার দরকার নেই, ভাবের দিকেই রাখা চাই। হৃদয়ের যত ভালবাসা, সব তাঁর পাদপদ্মে ঢেলে দেবে। জপ করতে করতে তাঁর কৃপা হয়। কৃপা হলেই মন স্থির হবে ও আনন্দ হবে।

৫২। মনে মনে জপ করাই সর্বশ্রেষ্ঠ জপ। প্রথম প্রথম সংখ্যা রেখে জপ করা ভাল। প্রতিদিন দু'বার করে আসনে বসে—এক এক বারে অন্তত এক হাজারের কম না হয়—জপ করবে। নাম-নামী অভেদ। তিনি দেখেন প্রাণ ; সংখ্যাও দেখেন না, সময়ও দেখেন না। ধ্যান না হলেও জপ ছাড়বে না।

৫৩। মহানিশা সাধন-ভজনের প্রকৃষ্ট সময়। যখন সকলে ঘুমিয়ে পড়বে, সেই সময় গভীর রাতে উঠে একান্ত মনে ভগবানকে ডাকবে, তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যাবে।

৫৪। রাত তিনটা-চারটার পর আর ঘুমুবে না। রাতে খুব সামান্য খাবে। মাঝে মাঝে রাতে খাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিয়ে সন্ধ্যা হতে সকাল পর্যন্ত জপ করবে।

৫৫। ধ্যানজপ করার পরই আসন ছেড়ে চলে যেতে নেই। তাতে ভাব দৃঢ় হয় না। ধ্যানভঙ্গের পর নিজ আসনে বসেই অন্তত কিছুক্ষণ ধ্যানের বিষয় ভাবতে হয়। এর পরে ধ্যানের অনুকূল খুব ভাল ভাল স্তবাদি পাঠ করতে হয়। তাতে ধ্যানের ভাব ও আনন্দ আরও ঘনীভূত হয়। আসন ত্যাগের পরও খানিকক্ষণ কারও সঙ্গে কথাবার্তা না বলে আপন মনে স্মরণমনন করতে হয়। তাতে অনুভব হয়—যেন সেই ধ্যানের নেশা লেগে রয়েছে। দিনান্তে অন্তত একবার নিজেকে সব থেকে গুটিয়ে নিয়ে আত্মস্থ করে ফেলবে।

৫৬। গায়ত্রী জপ অবশ্য করবে। গায়ত্রী অতি উচ্চাঙ্গের সাধনা। গায়ত্রীর কি কোন মূর্তি আছে? তিনি হচ্ছেন ত্রিজগৎপ্রসবিনী, ব্রহ্মশক্তি মা। ঠাকুরই গায়ত্রী।

৫৭। প্রীতির পূজায় বিশেষ কোন নিয়ম নেই। বাহ্য পূজায় অসুবিধা হলে মানসপূজা করবে—এও উত্তম।

৫৮। খুব প্রেমের সঙ্গে নাম করলে মন স্থির হয়ে আসে ও প্রাণায়াম আপনা হতেই হয়ে থাকে। আসল কথা হচ্ছে প্রেম ও আন্তরিকতা। আন্তরিক প্রার্থনাতে ধ্যান জপের কাজ

অনেক এগিয়ে যায়। 'ভক্তি দাও' বলে প্রার্থনা করবে। প্রার্থনা কখনও বিফল হবে না।

৬৯। প্রেমের সহিত একবার নাম করলেই উহা লক্ষ জপের চেয়ে বেশী হল। তাঁকে ডাকা সম্বন্ধে যে একটা বিশেষ উপায় আছে, তা নয়। কেবল তাঁকে ভালবাসতে চেষ্টা করবে। তাঁর কৃপা পেতে হলে তাঁকে ভালবাসতে হবে।

৬০। শোবার সময় ঠাকুর এসে দেখাতেন—চিৎ হয়ে বুকের ওপর মায়ের ধ্যান করতে করতে ঘুমুলে সুস্বপ্ন হয়। আমি তাঁকে মা-ই বলতুম, এখনও বলি। বলেছিলাম, "আপনি যে আমার চিন্ময়ী মা।"

৬১। তাঁর নামে ডুবে যাবে, তবে তো হবে। তবেই মনে শান্তি আসবে, আনন্দ পাবে। ভাসা ভাসা ডাকলে হবে না, ব্যাকুল হতে হবে। প্রেম বিনা তাঁকে পাওয়া যায় না।

৬২। ভাব যত সম্বরণ করতে পারা যায়, ততই ভেতরে তা বৃদ্ধি পায়। তা না হলে, যতটুকু ভাব ভেতরে হয়, ততটুকু বের হয়ে গেলে আর ভাব জমতে পায় না।

৬৩। প্রীতির সঙ্গে তাঁর নাম করাই জপ। জপের সঙ্গে সঙ্গে খুব একাগ্রভাবে ভাববে যে, তিনি সস্নেহে তোমার দিকে চেয়ে আছেন। সেই ভাবনা একইভাবে দীর্ঘকাল স্থায়ী হলেই ধ্যান। যত তাঁকে ভালবাসবে, ততই ধ্যান ও আনন্দ হবে। প্রীতি হলেই সন্তোষ, বিশ্বাসেই শান্তি।

৬৪। বিশ্বাস ও বিচার-পথ—দুই অবলম্বন করা ভাল। বিচার এমনভাবে করা চাই, যাতে বিশ্বাস দৃঢ় হয়। যে বিচার

মহাত্মাদের ওপর অবিশ্বাস এনে দেয়, তা অবিচার ; ঠিক বিচার নয়। বিশ্বাস হলেই ভক্তি প্রীতি আপনিই আসবে, না এসে থাকতে পারে না। ত্যাগ, বৈরাগ্য, চরিত্রবল, শ্রদ্ধা, ভক্তি যত বাড়বে, ততই বুঝবে যে সাধনপথে এগিয়ে যাচ্ছে। দেহযন্ত্রের জন্যে যেমন বিশুদ্ধ খাদ্যের দরকার, তেমনি মনের জন্যে দরকার পবিত্র চিন্তা।

৬৫। বহু জন্মের সুকৃতির ফলে ঠিক ঠিক সাধুসঙ্গ ও সাধুকৃপা লাভ হয়। ভগবদ্‌দ্রষ্টা পুরুষের কাছে গেলেই প্রাণে ঈশ্বরীয় ভাব জেগে ওঠে।

৬৬। পাল তুলে দেওয়া মানে পুরুষকার—নিজের চেষ্টা ও আন্তরিক অধ্যবসায় সহকারে সাধন-ভজন করা। যতদিন মানুষের অহংবুদ্ধি আছে, ততদিন অধ্যবসায় রাখতে হবে।

৬৭। অনাত্মবস্তুতে শান্তি নেই, আত্মজ্ঞান লাভেই প্রকৃত শান্তি। শান্তি ভেতরেই আছে, বাইরে নেই। সেই পরমানন্দের খনি তো ভেতরেই। মুক্তির অনুসন্ধানে বাইরে কোথাও যেতে হয় না।

৬৮। যতই ব্রহ্ম উপলব্ধি হবে, ততই জগৎকে দয়া, প্রেম, সেবা করতে ইচ্ছা হবে। সাবধান, শুষ্ক বেদান্তী যেন কখন হয়ো না! ঠাকুরের ঘরে শুষ্কতা নেই, ও বাইরের জিনিস।

৬৯। সাধনভজন নিয়ে কারো বড়াই করতে নেই। যদি তোমার নির্বিকল্প সমাধিই লাভ হয়, তাতেই বা কি? তুমি যা ছিলে, আবার তাই হবে ; এতে আর অহঙ্কার করবার কি আছে?

৭০। জীবন্মুক্ত ও দেহান্তে ব্রহ্মস্থ হওয়া—ঘরের দ্বারে এক পা ভেতরে, এক পা বাইরে—এই-ই জীবন্মুক্ত অবস্থা। আর একেবারে ঘরের ভেতর হচ্ছে—দেহান্তে একেবারে ব্রহ্মলীন হওয়া—বাইরের আর কোন জ্ঞানই থাকে না।

৭১। সংসার বড়ই সাধন-ভজনের বিঘ্নকর, কিন্তু ভগবৎ-প্রেমিকের পক্ষে বিবেক-বৈরাগ্যবৃদ্ধির হেতুস্বরূপ। তাঁদের যতই সংসার বিঘ্নকর বোধ হবে, ততই ভগবানে মন যাবে। সংসারের এইসব তাড়না ভগবদ্ভক্তির কারণ হয়। ভক্তেরা যত কষ্ট পায়, ততই তাঁকে আরো অধিক প্রবল বেগে ভক্তি করতে থাকে। বিশ্বাস ভক্তি বাড়ানোর জন্যেই প্রভু তাঁর ভক্তকে বিপদে ফেলেন।

৭২। কোন অভাব বোধ করবে না। হৃদয়ে ভগবৎ-প্রেম, ভক্তি থাকলে, সাংসারিক অভাব বোধই হয় না। সন্তোষ সদা হৃদয়ে বিরাজমান থাকে, এবং ভক্তের যা কিছু অভাব, প্রভুই সব পূরণ করে দেন। এজন্যে হতে হবে তাঁর ওপর নির্ভরশীল।

৭৩। ভক্ত জানে—যে ভগবান সুখ দিচ্ছেন, তিনিই আবার দুঃখ-কষ্টও দিচ্ছেন। তাই সবই শ্রীভগবানের দান, তাঁরই আশীর্বাদ জ্ঞানে নীরবে সহ্য করতে পারে। সংসারে সুখ যেমন অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী—দুঃখও তেমনি অনিত্য। ওসব আসে, আবার চলে যায়, কিছুই থাকে না। একমাত্র নিত্যবস্তু—একমাত্র শান্তির আলয় হলেন শ্রীভগবান।

৭৪। ভক্তদের বেশী ঘুরে বেড়ান ভাল নয়, তাতে ভক্তির হানি হয়। তাই একটু-আধটু ঘুরে চুপচাপ এক জায়গায় বসে

সাধনভজন করতে হয়। অবশ্য পরিব্রাজক অবস্থার আলাদা কথা, তখন একটা ব্রত নিয়ে থাকতে হয়।

৭৫। দক্ষিণেশ্বরের মা কালী খুব জাগ্রত, ওখানে মার বিশেষ প্রকাশ।

৭৬। স্বপ্নে তীর্থস্থান বা সাধুদর্শন অতি সুস্বপ্ন—নিশ্চয়ই।

৭৭। গঙ্গার হাওয়া যতদূর পর্যন্ত যায় পবিত্র হয়ে যায়। গঙ্গার পশ্চিম কূল বারাণসী সমতুল।

৭৮। কনখল, হৃষিকেশ অতি সাধন-উপযোগী স্থান।

৭৯। উত্তরাখণ্ডের মধ্যে উত্তরকাশী সাধন-ভজনের অতি অনুকূল স্থান। ওখানে মহাদেবের বিশেষ প্রকাশ।

৮০। বরফ না থাকলে কি হিমালয় মানায়?

৮১। বৃন্দাবন কি কম স্থান গা! স্বয়ং শ্রীভগবানের লীলাস্থল! ও স্থানের আধ্যাত্মিক আবহাওয়াই স্বতন্ত্র।

৮২। জগন্নাথ খুব জাগ্রত দেবতা।

৮৩। ভুবনেশ্বর সাধনভজনের খুব অনুকূল স্থান। মহা শৈবতীর্থ।

৮৪। তাঁর কৃপাই ভক্তের ভরসা। কৃপা হলে আর কিছু অভাব থাকে না।

৮৫। মন এক ভাবে যে বরাবর থাকে তা নয়, ওর গতি তরঙ্গের ন্যায়। একবার খুব উঁচুতে ওঠে, আবার খুব নীচুতে নেমে যায়—পুনরায় আরো বেগে ওপরে উঠবে বলে।

৮৬। তত্ত্বজ্ঞান মানে আর কিছু নয়—তিনি যে অন্তরাত্মা, সেইটি উপলব্ধি করা। তাঁকে হৃদয়ে অনুভব করাই তত্ত্বজ্ঞান।

৮৭। আত্মজ্ঞান ও ভগবৎকৃপা ভিন্ন কর্মনাশ হয় না। তিনি ইচ্ছা করলে কর্মভোগ কম করিয়ে দিতে পারেন, এমন কি, নাশ করেও দিতে পারেন। কর্মফলনাশ মানুষের চেষ্টার ওপর নির্ভর করে না, ভগবানের কৃপা ছাড়া অন্য উপায় নেই। ঠাকুর নিজে সাধন ভজন করে তার ফল জীবের কল্যাণের জন্যে দিয়ে গেছেন, তবেই তো মানুষের চৈতন্য হচ্ছে।

৮৮। মানবজীবনে জীবসেবা ছাড়া উচ্চকর্ম আর কি আছে? তাঁর মাধ্যমে জীবের সেবা কর, আর জীবের মধ্য দিয়ে তাঁর সেবা কর।

৮৯। প্রকৃত শান্তি বা পার্থিব কল্যাণ ধর্ম দ্বারাই সম্ভব। ধর্ম ভিন্ন উহা স্থায়ী হয় না। ধর্ম জিনিসটা প্রত্যক্ষ আধ্যাত্মিক অনুভূতির বিষয়।

৯০। ভক্ত কে? স্বয়ং ভগবানই নিজ লীলা আস্বাদন করার জন্যে একাংশে ভক্তরূপে আবির্ভূত হন। তাই ঠাকুর বলতেন, "ভাগবত, ভক্ত, ভগবান।"

৯১। ঠাকুর বলতেন যে, গৃহস্থের ডাক ভগবান বড় শোনেন। কারণ তিনি বেশ জানেন, এদের ঘাড়ে কত বোঝা চাপান আছে। তাই একটুকুতেই সংসারীদের ওপর তাঁর দয়া হয়। তিনি ভক্তকে বড় ভালবাসেন।

৯২। দীক্ষান্তে মাছ বঁড়শিতে গাঁথা হয়ে গেল। জেলে হয় এখনই, না হয় একটু খেলিয়ে তীরে অবশ্যই টেনে তুলবে।

৯৩। তাঁর ফুলবাগানে নানাবিধ ফুল, কোনটি অপেক্ষা কোনটি নিকৃষ্ট নয়; সবই উৎকৃষ্ট। গোলাপ গোলাপই, বেল

বেলই, জুঁই জুঁইই, জবা জবাই ; সকলেই নিজে নিজে ভাল। যাকে যিনি যে ভাবে চালাচ্ছেন, সে সেইভাবেই চলেছে। সবই ভাল।

৯৪। ঠাকুর ক্রমাগত শিবের গান শুনতে পারতেন না। শিবের ধ্যান হল নির্বিকল্প অবস্থা। সেখানে সৃষ্টি নেই, জীব-জগৎ নেই। তাঁর মনের স্বাভাবিক গতিই ছিল নির্বিকল্পের দিকে। তিনি এসেছিলেন জগতের কল্যাণের জন্যে, তিনি তাই বেশীক্ষণ নির্বিকল্প অবস্থায় থাকতে পারতেন না।

৯৫। তিনি যদি তোমায় তাঁর চিন্ময় ধামে রেখে নিত্যসেবায় রাখেন—অতি উত্তম। আবার যদি তিনি তোমায় তাঁর নিরাকার জ্যোতিতে নিয়ে যান, তাও উত্তম।

৯৬। সংসারই এই রকম—এর এক দিকে আলো, অন্য দিকে অন্ধকার। যে এর সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলবে, সেই হাবুডুবু খাবে। কিন্তু যে জানে যে, এই সংসারে কেবল তিনিই একমাত্র সত্য, সে তাঁকে ধরে থাকে, আর তার কিছু বিঘ্ন হয় না। সংসারে দুঃখ চিরকালই থাকবে, মাঝে মাঝে এক একজন মহাপুরুষ আসেন ও কতকটা দুঃখ কমে যায়, কিন্তু দুঃখ আবার আসে।

৯৭। বিঘ্নবাধা না থাকলে কাজের জোর হয় না, ভক্তদের মনে একটা জেদ বা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা না হলে কোন কাজে সিদ্ধিলাভ হয় না।

৯৮। মূর্খ হলেই যে ভগবান লাভ হয়—তা নয়, আবার পণ্ডিত হলেই যে তাঁকে লাভ হয়, তা নয়। তাঁকে লাভ তাঁর

কৃপা ভিন্ন হয় না। তিনি ভাল না বাসলে কেউই তাঁকে ভালবাসতে পারে না।

৯৯। স্বপ্নে ভগবান-দর্শন করলেও চিত্ত শুদ্ধ হয়। যারা স্বপ্নে প্রায়ই ভগবানের রূপ দর্শন করে, তাদের জন্মান্তরের সংস্কার শুদ্ধ আছে।

১০০। কথামৃত ভাল করে পড়বে, ওতে সবই আছে। ধর্মের গূঢ় কথা সব সহজ সরলভাবে ওতে বোঝান আছে। শ্রীম হচ্ছেন সংঘের ব্যাস। আমি আজকাল বেশী পড়ি নে, ঐ কথামৃতই দেখি, আর স্বামীজীর বীরবাণী।

স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর কথা

১। শ্রীরামকৃষ্ণ যে আমার একান্ত নির্ভর ও গতি! তাঁর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে আমি চলেছি।

২। শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণ বুদ্ধির জ্ঞানগোচর হবার নন, তিনি এতই মহান্। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে দিয়ে জগতে প্রকট হয়েছেন। স্বামীজীর শিক্ষার আলোক ব্যতীত শ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝতে যাওয়া পাগলামি মাত্র।

৩। শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণের পবিত্র সঙ্গ একটা দুর্লভ সুযোগ। জন্মজন্মান্তরের সুকৃতির ফলে তাঁদের আশীর্বাদ লাভ হয়। যাঁরা আশীর্বাদ লাভ করেছেন, তাঁরা প্রকৃতই ভাগ্যবান।

৪। ঠাকুরের ধ্যান কর। ধ্যান করলেই তাঁর ভাবগুলো ভেতরে ঢুকবে। ঠাকুরের আশ্রয়ে যখন এসে পড়েছ, তখন তাঁর কৃপা নিশ্চয় পেয়েছ জানবে।

৫। যতদিন এ শরীরটা আছে, কেবল তাঁর নাম করে যাও। সব চেয়ে সহজ সাধন—সর্বদা তাঁর স্মরণ-মনন।

৬। জপধ্যান দ্বারাই কুণ্ডলিনীর জাগরণ হয়, ইহাই সর্বাপেক্ষা সহজ উপায়। আবার গুরুর কৃপায় তো উহা হয়ই, এমন কি ব্রহ্মজ্ঞান পর্যন্ত হয়।

৭। গভীর রাতে জপ করতে হয়, আর না হয় ব্রাহ্মমুহূর্তে ও সন্ধ্যায়। জপের সঙ্গে ইষ্টের ধ্যান করবে। শীতকালই ধ্যানজপের সময়।

৮। ধ্যানে প্রথমে কল্পনার সাহায্য নিতে হয়, পরে উহা সত্যে পরিণত হয়। উহা হতে সত্য-উপলব্ধি হয়।

৯। ধ্যানকালে ইষ্টমূর্তিকে জ্যোতির্ময় ভাবতে হয়—যেন তাঁর জ্যোতিতে সব আলোকিত।

১০। ধ্যান যতই জমবে, ততই ভেতরে আনন্দ। তাঁর দিকে মন যত বেশী যাবে, আনন্দ তত বেশী হবে। আর সংসারের দিকে, ভোগের দিকে মন যত বেশী যাবে, ততই দুঃখকষ্ট বেশী হবে।

১১। প্রথম প্রথম ধ্যান তো মনের সঙ্গে যুদ্ধ। মনের স্বভাবই হচ্ছে এই যে ভগবৎভাব থেকে টেনে এনে বিষয়ে নাবিয়ে দেওয়া।

১২। ব্রাহ্মমুহূর্তে সুষুম্না নাড়ীর ক্রিয়া আরম্ভ হয় বলে দুই নাকে নিশ্বাস বইতে থাকে, তাই মন স্থির হয়। সাধারণত হয় ইড়া, না হয় পিঙ্গলা দ্বারা শ্বাস বইতে থাকে, তাতে মন চঞ্চল হয়।

১৩। অমাবস্যা, পূর্ণিমা, অষ্টমী তিথিতে এবং কালীপূজা, দুর্গাপূজা ও জগদ্ধাত্রী পূজার দিনে বিশেষ করে জপধ্যান করতে হয়।

১৪। নামই এ যুগের সাধন। ভগবান ও তাঁর নাম অভিন্ন। যদি আকুল হয়ে একমনে শুধু তাঁর নামই জপ করা যায়, তবে তাতেই মুক্তিলাভ হয়। নামের অসীম শক্তি। নামের আগুন জ্বলে উঠলে ভেতরকার সমস্ত জঞ্জাল পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

১৫। জপের সময় না পেলেও স্মরণ-মনন ছাড়বে না। সারাদিনের মধ্যে দু'ঘণ্টা সময় অন্তত দেওয়া চাই।

১৬। নামের শক্তিতে ভোগবাসনা কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। যারা কাতর হয়ে ডাকে, ভগবান তাদের সংসারের ঝামেলা ক্রমেই কমিয়ে দিয়ে শেষকালে রেহাই দেন।

১৭। সংসারে থেকেও জানবে, এ আমার ঠিক ঘর নয়, একটা বাসা মাত্র। শ্রীভগবানের পাদপদ্মই আমার আসল ঘর। যে কোন প্রকারেই হোক, সেথায় আমাকে যেতে হবে।

১৮। মন্ত্র নামের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নয়।

১৯। শিষ্যের জ্ঞানলাভ না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত গুরু যিনি তিনি শিষ্যকে পথ দেখাবার জন্যে, তার মুক্তির জন্যে অপেক্ষা করেন।

২০। প্রকৃত গুরু বস্তুতই শিষ্যগণের ভার গ্রহণ করেন, অলৌকিক উপায়ে তিনি শিষ্যকে রক্ষা করেন।

২১। সদ্‌গুরু মন্ত্রদান কালে সেই মন্ত্রের সঙ্গে এক বিশেষ আধ্যাত্মিক শক্তি শিষ্যে সঞ্চার করেন। তা দ্বারা অপেক্ষাকৃত অল্প চেষ্টায় ও অল্প সাধনায় শিষ্য কৃতকার্য হন।

২২। গুরুতে আশ্রিত শিষ্যের কোন অমঙ্গল হতে পারে না। গুরুর কৃপায় তার চতুর্দিক লোহার বেড়া দিয়ে ঘেরা।

২৩। কোন বিশেষ উন্নত মহাপুরুষের সঙ্গে বিশেষ আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হলে, তাঁর জীবনে উপলব্ধ সত্যগুলি অনায়াসে নিজ জীবনে আয়ত্ত করার সুবিধা হয়।

২৪। 'কাম জয় করবো, ক্রোধ জয় করবো' বলে চেষ্টা করলে রিপু জয় করা যায় না। ভগবানে মন দিলে ও-সব আপনা থেকেই কমে যায়।

২৫। অনিত্য পদার্থে যার যত আসক্তি, তার ততই অশান্তি।

২৬। সে-ই ঠিক ত্যাগী, যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ভগবানকে দিয়েছেন, আমার বলে কিছু রাখেন নি।

২৭। মানুষকে ভাল না বাসলে, মানুষের ভেতর যিনি আছেন, তাঁকে পাওয়া যায় না। ভগবানকে লাভ করতে হলে নিজের প্রাণটা ভালবাসায়, পবিত্রতায় ভর্তি করে ফেলতে হবে। মহাপুরুষ তিনিই, যিনি সবাইকে সমান ভালবাসেন।

২৮। শুদ্ধ আধার না হলে সত্যিকারের মহাপুরুষকে চিনতে পারা যায় না। সংযমী, পবিত্র না হলে সে আধারে মহাপুরুষদের ভাব খেলে না। শুদ্ধ পবিত্র না হলে ভেতরের দৃষ্টি খোলে না।

২৯। মার কাছে ব্রহ্মজ্ঞানের চাবি। মা কৃপা করে চাবি দিয়ে না খুললে যে আর উপায় নেই, তাই আগে শক্তির পূজা। মাকে চেনা বড় শক্ত, মা সাক্ষাৎ জগদম্বা।

৩০। ঠাকুরের কৃপা পেতে হলে প্রথমে মাকে প্রসন্না করতে হবে। শ্রীশ্রীমাকে দেখলেই ঠাকুরকে দেখা হবে।

৩১। শাস্ত্রকে সেবা করলে শাস্ত্র সেবকের প্রতি কৃপা করেন ; শাস্ত্রই গুরুর কাজ করেন। রোজ কথামৃত পড়বে, তা হলেই হবে। কথামৃতের মধ্যে সব ধর্মই আছে।

৩২। যোগবাশিষ্ঠ, অষ্টাবক্র সংহিতা—পুস্তকগুলি জ্ঞানের আদর্শ।

৩৩। ক্ষেত্রের মধ্যে কাশীধাম শ্রেষ্ঠ। এখানে নিত্যই একটা আধ্যাত্মিক তরঙ্গ বইছে। এখানে একটু জপধ্যান করলেই জমে যায়। কাশীর তুল্য স্থান নেই। এখানে রাত চারটার সময় ধ্যান করতে বসলে তন্ময়তা লাভ করা যায়।

৩৪। কাশীতে বেঁচেও সুখ, মরেও সুখ। আবার ; 'সকল তীর্থ আছে আমার গুরুর চরণে, তবে আমি কাশী বদরী যাবো কি কারণে ?' ব্রহ্মজ্ঞ সদ্গুরুই সব তীর্থের সার। তাঁতে পূর্ণ বিশ্বাস থাকলে তীর্থে যাবার দরকার হয় না ; তাঁর কৃপাতে সব তীর্থের ফল পাওয়া যায়।

৩৫। শ্রীবৃন্দাবনে মহানিশায় আধ্যাত্মিক তরঙ্গের প্রবাহ চলতে থাকে। সেই সময় সেখানে জপধ্যান করলে প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যায়।

৩৬। কনখলের আবহাওয়াই পবিত্র। গঙ্গা ও হিমালয় ওখানে মনকে স্বভাবতই ধ্যানপ্রবণ করে।

৩৭। ভুবনেশ্বর যোগভূমি, পুরী ভোগভূমি। ভুবনেশ্বর শিবক্ষেত্র, গুপ্তকাশী। এখানে একটু সাধন করলে অনেক ফল পাওয়া যায়। সাধন-ভজনের বিশেষ অনুকূল স্থান, ধ্যান সহজেই জমে। পুরীতে অপরাহ্ন কাল জপধ্যানের প্রশস্ত সময়।

৩৮। ওঁকারনাথ স্থানটি অতি উত্তম, নর্মদার ধারে।

৩৯। যদি একসঙ্গে, এক মুহূর্তে সব তীর্থের ফল পেতে চাও, তবে চলে যাও দক্ষিণেশ্বরে। দক্ষিণেশ্বরে সব তীর্থের মেলা।

৪০। 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' কথাটার মানে জগৎটা আমরা যেমন দেখছি, তা সব মিথ্যা। সমাধিতে জগৎ থাকে না। সুষুপ্তির পর যেরূপ আনন্দ থাকে, নিরন্তর সেইরকম আনন্দ অনুভব হয়। তখন 'আমি', 'তুমি' কিছুই থাকে না, থাকে কেবল সচ্চিদানন্দ। সমাধির পর আনন্দের জের অনেকক্ষণ থাকে, কেউ কেউ বলেন—আজীবন থাকে। ভক্তও সেই অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করে সম্ভোগের জন্যে 'আমি'টা রেখে দেয়।

৪১। তিরুপতি মহাজাগ্রত, চৈতন্যময় স্থান। বালাজী বেঙ্কটেশ্বর আদিতে দেবীমূর্তি। কন্যাকুমারী, রামেশ্বর প্রভৃতি খুব স্থান, খুব উদ্দীপন হয়।

স্বামী প্রেমানন্দজীর কথা

১। ঠাকুর হচ্ছেন জীবন্ত, জ্বলন্ত উপনিষৎ, জীবন্ত গীতা। তিনি চরাচর সর্বত্র পরিব্যাপ্ত।

২। শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুর অভেদ। শ্রীশ্রীমাকে দেখাও যা, ঠাকুরকে দেখাও তাই। তাঁর অসীম কৃপা জীবের ওপর। আমরা এক কণা পেলেই পূর্ণ হয়ে যাব।

৩। শ্রীশ্রীমার অপ্রাকৃত ভাগবতী তনু, যদিও তিনি মনুষ্যদেহধারিণী। কোটি কোটি জন্মের ফলে শ্রীশ্রীমার দর্শন হয়। লৌহ একবার পরশপাথর ছুঁলেই সোনা হয়। তুমি জান আর নাই জান, পরশপাথররূপ পরমারাধ্যা মার শ্রীপাদস্পর্শে তোমার দেহমনরূপ লৌহ, সোনা—কিনা ভোগাসক্তি ত্যাগ করে যোগভক্তি লাভে অনুরাগী হয়েছে। আমাদের জন্য আমাদের অপেক্ষা তাঁরই অধিক চিন্তা। বুড়ো হলেও মার কাছে আমরা কচি, ছেলেমানুষ।

৪। শ্রীশ্রীমাঠাকরুণকে দেখেছি, ঠাকুরের চেয়েও আধার বড়। তিনি শক্তিরূপিণী কিনা, তাঁর চাপবার শক্তি কত! ঠাকুর চেষ্টা করেও পারতেন না. বাইরে বেরিয়ে পড়ত। মার ভাবসমাধি হচ্ছে, কিন্তু কাউকে জানতে দেন?

৫। ঠাকুর নিজ জীবনে অদ্বৈতভাব চেপে বেশীর ভাগ ভক্তিই প্রচার করেছেন। আর স্বামীজী ভক্তিকে চেপে অদ্বৈতভাব প্রচার করেছেন। কিন্তু স্বামীজীর মত ভক্তিমান লোক আর কয়টি আছেন?

৬। স্বামীজীকে না বুঝলে ঠাকুরকে বোঝার সাধ্য নেই। রামচন্দ্রকে বুঝতে হলে আগে তাঁর ভক্ত হনুমানজীকে বুঝতে হয়। আর স্বামীজীকে বুঝলেই ঠাকুরকে বোঝা হল।

৭। ভাব, মহাভাব, সমাধি হওয়াটাই ঠাকুরের

স্বাভাবিক। মনকে জোর করে নীচে নামিয়ে রাখতে তিনি চেষ্টা করতেন।

৮। সর্বদা জানবে আমি শ্রীশ্রীপ্রভুর সন্তান। যারা ঠাকুরের ভক্ত, তারা জীবন্মুক্ত। তাঁকে যে আপনার করে নেয়, সেই আপনার লোক।

৯। অশরীরী ভগবান ভক্তের জন্য দেহধারণ করে অবতীর্ণ হন, অশেষ দুঃখকষ্ট অকাতরে আমাদের জন্যে সহ্য করেন, এসব প্রত্যক্ষ করেছি, অনুভব করেছি।

১০। ঠাকুরকে ধরার নাম ভাবশুদ্ধি। তাঁকে জানবে খুঁটি। খুঁটি ছেড়েছ কি পড়েছ। ভয় নেই, ভয় নেই, ঠাকুর রয়েছেন সামনে, পশ্চাতে। ঠাকুররূপী খুঁটি প্রাণপণে পাকড়ানোর নাম গীতার স্থিতপ্রজ্ঞ, স্থিতধী।

১১। ভালবাসায় জগৎকে জয় কর—ইহাই রামকৃষ্ণ-মিশন।

১২। ঠাকুরকে পেতে হলে হৃদয়টি সম্পূর্ণ পবিত্র করতে হবে। ভয় কি? ডুব দাও তাঁর নামে।

১৩। ধ্যানজপ, নিষ্কাম কর্ম দ্বারা মন ক্রমশ সূক্ষ্ম হয়। সেই সূক্ষ্ম মনের দ্বারা মনের যে বিচার, তাকেই বলে—উর্ধ্বরেতাত্মনাত্মানম্।

১৪। গুরু, ইষ্ট একই জেনে ধ্যান করবে। যখন যেটি ভাল লাগে, যেটি খুশী তাতেই ধ্যান করে যাও।

১৫। পবিত্রতাই শক্তি ও ভগবান। জ্ঞানভক্তি প্রীতি—এসব আমাদেরই ঘরের বস্তু জানবে।

১৬। কেবল কাজ করলে জীবন শুষ্ক বোধ হয়ে যাবে, তাই ভক্তিযোগ চাই ; বিচার চাই, জ্ঞানও চাই।

১৭। এই যে কাজকর্ম—সব ছাই ভস্ম। কে কার উপকার করবে ? মাঝে পড়ে নিজের কল্যাণ—চিত্তশুদ্ধি হয়ে যায়।

১৮। জানবে, তোমরা সব ঠাকুরের, আর ঠাকুরও তোমাদের। ঠাকুর আমাদের, আমরা ঠাকুরের।

১৯। আনন্দ অনৈসর্গিক বস্তু। সকল আনন্দের আকর ঠাকুরের নাম।

২০। আপনার দোষ দেখাই সাধুত্ব। বিনয় হচ্ছে সাধুর ভূষণ। পরের স্বার্থ দেখাই সাধুত্ব।

২১। তাঁর স্মরণ, মননই হচ্ছে মনের চাঞ্চল্য দূর করার একমাত্র মহৌষধ। তাঁর কথাগুলি ধ্যান করে নিতে হবে।

২২। রোগের সেবা করছি মনে করবে না, জানবে মার সেবা করছি। এইটে পাকা হলেই একে জ্ঞান, ভক্তি বলে। সকলকে, পৃথিবীশুদ্ধ লোককে আপনার করতে হবে।

২৩। তেজ না থাকলে কিছুই হবে না। এই তেজরূপ রজঃ হৃদয়ে না এলে সত্ত্বগুণ কখনও মনে প্রতিফলিত হবে না।

২৪। সময় হলে ভগবান নিজেই এসে আমাদের খেলাঘর ভেঙ্গে দিয়ে নিজের কাছে টেনে নেন।

২৫। যতক্ষণ "নাহং, নাহং—তুঁহু, তুঁহু"—এই ভাব ঠিক ঠিক না হয়, ততক্ষণ 'আয় মা সাধন-সমরে ; ডঙ্কা মেরে লব মুক্তিধন'—এই 'বিস্তার আমি' আনতে হবে।

২৬। সুখ কিম্বা দুঃখ কিছুতেই বিহ্বল না হয়ে 'অবস্থা-

বিপর্যয় প্রভুর বিধান এবং সমস্তই কল্যাণের জন্যে'—এইটি মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে ধারণা কর। সর্বদা মনে রাখবে, তিনি তোমাদের রক্ষা করছেন।

২৭। প্রাক্তন পুরুষকারই দৈব। পুরুষকার যেখানে সফল হয় না, বুঝবে সেখানে নিজের পূর্বজন্মের দুষ্কর্ম প্রবল; অথবা চেষ্টার ত্রুটি বা দোষ আছে। ইহজন্মে সৎকর্ম করতে করতে প্রাক্তন দুষ্কর্ম ক্ষীণ হয়। দীর্ঘকাল ভাল কাজ করতে করতে মনে শুভ-সংস্কার বসে যায়।

২৮। বাসনা দুই রকম—শুভ ও অশুভ। সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা, পরোপকার, তীর্থভ্রমণাদি করার বাসনা শুভ। যে বাসনা মনের বাঁধন খোলবার সাহায্য করে, তা শুভ।

২৯। আসক্তিই বন্ধন। ঐ আসক্তি আবার মোক্ষের দরজা খুলে দেয়, যদি কেউ ভগবানে বা সদ্গুরুতে আসক্ত হয়। একেই বলে মনের মোড় ফিরিয়ে দেওয়া।

৩০। আত্মার বন্ধন মোচন-ই চরম স্বাধীনতা। তাতেই পরমানন্দ, পরম শান্তি। ওরাই ত আসল পরাধীন—ভোগ-লালসার পরাধীন। পরাধীনতার জন্যে হিন্দুধর্ম আদৌ দায়ী নয়। উহা ব্যবহারিক জগতে দৈনিক জীবনে পরিণত না করাই দোষ।

৩১। বিজ্ঞান একদিক দিয়ে কষ্ট দূর করার চেষ্টা করছে। আবার অপরদিকে ভয়ঙ্কর বিপ্লব আনছে। তাই রামের শরণই সর্বাপেক্ষা সমীচীন।

৩২। সাধু-সন্ন্যাসী স্বপ্নে দেখা খুব উত্তম। ও-কথা যার তার কাছে বলা ভাল নয়।

৩৩। প্রেমই পরম পুরুষার্থ। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ভাব, শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব কে বুঝবে? যাদের দেহবুদ্ধি একটুও আছে, তারা রাধাকৃষ্ণের ভাব বুঝতে পারবে না।

৩৪। সম্পূর্ণরূপে, চিরকালের জন্যে তাঁর হয়ে যাও। দেহে, মনে, আত্মায় তাঁর হয়ে যাও। তা হতে পারলে ধর্ম বলতে যা বোঝায় ও ধর্ম যা, তা উপলব্ধ হয়ে যাবে। কেবলমাত্র তাঁর হতে পারলেই সকল মানব-কর্তব্য ও দায়িত্বের যা লক্ষ্য সেখানে পৌঁছুতে পারবে।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর কথা

১। যে মহাশক্তি অসীম, অগম্য, তিনিই এই যুগে ভক্তগণের কাছে সুলভ হবার জন্যে রামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণের ফটোকে ফটো মাত্র মনে করো না, উহা তাঁর জীবন্ত মূর্তি। তিনি প্রেম ও দয়ার অবতার। তাঁর চেয়ে দয়াবান আর কেউ নেই। যিনি ঠাকুরের দেহধারণ করেছিলেন, তিনি মা কালী ভিন্ন অন্য কেহ নন। তিনি ভগবান রামকৃষ্ণ-রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ও মানবজাতির ওপর আশীর্বাদ বর্ষণ করেছিলেন।

২। শ্রীরামকৃষ্ণকে পূজা করলে আপনি শাক্ত হতে বিরত হন না, কারণ আপনার কুলদেবতা যে শক্তি, শ্রীরামকৃষ্ণ সেই শক্তিরই মানববিগ্রহ। শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যান ও তাঁর কাজের জন্যে আপনি দেহধারণ করুন। সর্বান্তঃকরণে তাঁর চিন্তা করে এই জন্মেই বিমুক্ত হন। এ জগতে প্রত্যেক সাধকই শাক্ত। শক্তির আরাধনা করেন না, এমন কে আছেন? শক্তিহীন

ঈশ্বরকে কে উপাসনা করেন ? তাঁর শক্তিকে বাদ দিয়ে ঈশ্বরকে ধারণা করা যায় না, যেমন মিষ্টতাকে বাদ দিয়ে চিনির ধারণা হয় না।

৩। অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তির ন্যায় ঠাকুর ও মা অভেদ।

৪। শ্রীরামকৃষ্ণের ভেতর দিয়ে জগৎপ্রসূতি কালীর আমিত্বই সর্বতোভাবে প্রকাশ পেত। বিশ্বজননী, লীলাময়ী কালীই শ্রীরামকৃষ্ণ-বিগ্রহ ধারণ করে তাঁর অসংখ্য পুত্রকন্যাকে জ্ঞানভক্তি দেবার জন্যে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

৫। ঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের প্রায় সকলেই তাঁর অদর্শনের পর তাঁর দর্শন পেয়েছেন।

৬। মহারাজকে (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ভক্তি করা আর ঠাকুরকে ভক্তি করা একই কথা।

৭। স্বামীজীকে দেখা আর ঠাকুরকে দেখা একই কথা। উভয়ে অন্তরে অভিন্ন, দেহমাত্র ভিন্ন।

৮। বাবুরামদা (স্বামী প্রেমানন্দ) ও ঠাকুর আলাদা নয়। যারা ঠাকুরকে দর্শন করেন নি, বাবুরামের দর্শনে তাদের শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন সিদ্ধ হয়েছে।

৯। ঠাকুর অধিকক্ষণ গেরুয়া কাপড় পরতে পারতেন না, কারণ গেরুয়া কাপড় পরলেই তিনি বাহ্যজ্ঞান হারাতেন ও সমাধিস্থ হতেন।

১০। চরাচর সমস্ত জগৎ মহাকাল-শক্তি কালীর অধীন। এই কালশক্তিই ঈশ্বর। কালশক্তিই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ। এইজন্যে শাস্ত্রকার তাঁকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের জননী বলেছেন।

তিনিই ব্রহ্মনামে অভিহিত। শ্রীকৃষ্ণের ভেতর এই মহাকালীর বিকাশ সমধিক পরিমাণে ছিল, এই কারণে তিনি ঈশ্বরাবতার। যিনি অব্যয়, তিনি পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে পরিণত হন। প্রকৃতি বা শক্তি স্রষ্টার হৃদয়ে থাকেন। লক্ষ্মী নারায়ণের হৃদয়ে থাকেন, স্রষ্টা বা পুরুষ অনন্ত ব্রহ্মে থাকেন আর ব্রহ্ম আপনাতে আপনি থাকেন। তিনি অনন্ত, তাই তিনি নিষ্ক্রিয়।

১১। বহির্দৃষ্টিতে ঈশ্বর বহু, অন্তর্দৃষ্টিতে তিনি এক। পরিধির দিক হতে ব্যাসার্ধ বহু, কেন্দ্রের দিক হতে এক। সত্যদৃষ্টির সহায়ে দেখলে সত্তা এক ব্যতীত দুই নেই। আপেক্ষিকত্তার দিক হতে দেখলে একই সত্তা বহুরূপে প্রতিভাত হয়। যে সুখের বিচ্ছেদ নেই, তাঁকেই ভগবান বলে, আর যে সুখের বিচ্ছেদ আছে তাকে ইন্দ্রিয়পরায়ণতা বলে।

১২। ব্রহ্ম নিত্য, দেশ-কাল-নিমিত্তের অতীত, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। জগৎ দেশ-কাল-নিমিত্ত হতে জাত ও মিথ্যা। মিথ্যা শব্দের অর্থ—আদিমান ও অন্তযুক্ত, অনিত্য। মিথ্যা অর্থে শূন্য নয়, এই-ই শ্রীমৎ শঙ্করের অনুমোদিত অর্থ ও গ্রাহ্য।

১৩। দু'টি পরস্পর-বিরোধী বিন্দুর মিলন-স্থানে ঈশ্বর সর্বদা স্পষ্টতররূপে প্রভায়মান হন। তিনি আলোকও নন, অন্ধকারও নন, তিনি এই উভয়ের অতীত। ঠিক এদের মিলন-স্থানে তাঁকে দেখা যাবে। সেইজন্যে দিবা ও রাত্রির সন্ধি-সময়ে প্রাতে ও সন্ধ্যায় ধ্যানাভ্যাস প্রশস্ত। মধ্যাহ্নে সূর্য যে সময়ে শিরোপরি বিরাজমান এবং রাত্রির মহাকালকেও সন্ধি-সময় বলে। মন সন্ধিক্ষণে তার সর্বোচ্চ স্তরে আরোহণ করে।

১৪। যদি পরব্রহ্মকে রূপের সীমার মধ্যে আনা অযৌক্তিক মনে হয়, তো তাঁকে কতকগুলি বিশেষ গুণের দ্বারাই বা সীমাবদ্ধ করা যায় কিরূপে? অতএব তিনি সাকার দিব্যমূর্তিতে প্রকট হতে পারেন।

১৫। নির্বিকল্প সমাধিতে উপাস্য ও উপাসক একীভূত হন। কিন্তু যতক্ষণ ব্যক্তিত্ব আছে, ততক্ষণ সাকার ঈশ্বর থাকেন।

১৬। জগজ্জননী পছন্দ করেন না যে, আমরা আমাদেরকে তাঁর ভৃত্য বলে পরিচয় দেই। আমরা তাঁর সন্তান, ভৃত্য নই। তাঁর পুত্র বলে প্রকৃত গর্ব অনুভব কর।

১৭। তুমি ঈশ্বরের প্রকৃত শ্রেষ্ঠ মন্দির। বাইরের মন্দিরগুলি হৃদয়-মন্দিরের স্মারক মাত্র।

১৮। সাধুসেবা করলেই ঈশ্বরসেবা হয়।

১৯। আমাদের মধ্যে যে পশুত্ব আছে, ওর বিনাশকেই নরবলি বলে। উচ্চতর আদর্শে উপনীত হওয়ার জন্যে নিয়ত চেষ্টাই প্রকৃত মানুষের বিশেষত্ব। খাদ্য ও আশ্রয় পেলে পশু আর তার স্থান পরিত্যাগ করতে চায় না।

২০। তিনি সর্বমঙ্গলময়। যদি তিনি দুঃখকষ্ট দেন, তবে নিশ্চয়ই জানবে, এ দুঃখকষ্টের মধ্যেও তাঁর দয়া নিহিত আছে। যাকে আমরা দুঃখ বলি, বাস্তবিক তা দুঃখ নয়—দীক্ষা। ক্ষণিক সুখের লোভে তাঁকে ভুলে যাই বলে, তিনি কৃপা করে দুঃখরূপ দীক্ষা দিয়ে তাঁকে মনে করিয়ে দেন।

২১। তাঁর দয়া দুইভাবে অনুভব করতে হয়। অনুকূল দয়া ও প্রতিকূল দয়া। যখন জাগতিক ঐশ্বর্য দিয়ে খেলাঘর

সাজিয়ে দেন, তখন সেটি তাঁর অনুকূল দয়া। যখন সেগুলি একে একে কেড়ে নিয়ে চোখের জলে ভাসিয়ে তাঁর দিকে টেনে নেন, তখন হচ্ছে তার প্রতিকূল দয়া।

২২। আত্মদর্শী পুরুষের নিকট এই জগৎ অসার। কারণ, আপনার অন্তরে তিনি অফুরন্ত সম্পদ, অনন্ত জীবন, অপার জ্ঞান ও অশেষ আনন্দ লাভ করেছেন। দেব-মানবগণই আধ্যাত্মিকতার আবিষ্কর্তা।

২৩। একমাত্র অজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তিই জিজ্ঞাসু হন না।

২৪। শরণাগতি অভ্যাস কর। পুরুষকারের অসামর্থ্য উপলব্ধ না হলে ঈশ্বর লাভ হয় না। সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ ব্যতীত ঈশ্বর দর্শন অসম্ভব। আত্মসমর্পণ ষোলআনা হলে মুক্তি অবধারিত। নিঃশেষে আত্মসমর্পণ ও মুক্তি একই কথা।

২৫। সন্দেহ করা ও চিন্তা করা একার্থবোধক। কতক্ষণ তুমি চিন্তা করতে পার? যতক্ষণ তোমার মনে সন্দেহ আছে। যখনই তুমি কোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসবে তখনই তুমি সেই বিষয়ের চিন্তা হতে বিরত হবে। যতই চিন্তা করবে, ততই সন্দেহ বাড়বে। মন মানুষকে যথার্থ নির্দেশ দানে অক্ষম, মনের অতীত হও, তুমি সকল সন্দেহের পারে যাবে। মনের মধ্যে বাসনা, কামনা, লোভ ও সন্দেহ বাসা বাঁধে। মনাতীত অবস্থা লাভই উচ্চতম সদসৎ বিচারের ফল। মন যতই চঞ্চল হবে, দুর্বলতা ততই বাড়বে। মন যত শান্ত হবে ততই ইহা শক্তিশালী হবে।

২৬। স্বপ্নকে যেমন তুমি অসত্য বলে জান, জীবনের এই

ক্ষুদ্র পরিসরকে ঠিক তেমনি স্বপ্নেরই মত দেখ। স্বপ্ন ছিল না, তুমি স্বপ্ন দেখলে এবং পুনরায় স্বপ্ন থাকল না। স্বপ্ন যেমন অলীক, এই জীবনও সেই রকম নশ্বর। যে কোন মুহূর্তে মৃত্যুর আহ্বান আসতে পারে।

২৭। আধ্যাত্মিকতার অর্থ—অহমিকার উচ্ছেদ।

২৮। ভক্তির শক্তিতে আমিত্বের বিনাশ হয়। ভক্তিই ভক্তের প্রাণ। ঈশ্বরে আত্মসমর্পণই ভক্তি।

২৯। যে মানব ঈশ্বরকে বারেক অনুভব করছে, সে সারা জীবনই তাঁকে অনুভব করতে থাকবে। সেই অনুভূতির বিরতি বা বিনাশ নেই। মানুষ মানুষ হিসাবে সর্বজ্ঞ নয়। যখন সে অনন্তের সঙ্গে এক হয়ে যায়, তখনই মানুষ সর্বজ্ঞ হয়।

৩০। এক অর্থে সকল মানুষই প্রকারান্তরে ভগবানকে ভালবাসে, কারণ সকলেই অনন্ত জীবন, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত আনন্দ চায়; এবং ঈশ্বরই এই ত্রিরত্নের আকর।

৩১। মহম্মদ সাত পরদা কাপড় দিয়ে চোখ বেঁধেও স্বর্গের আলোক এড়াতে পারেন নি। এর অর্থ—মহম্মদের এই দিব্য আলোক ছিল তাঁর অন্তরের। অর্থাৎ তাঁর হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ জ্ঞানালোকে প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল।

৩২। শ্রীরামকৃষ্ণ বস্তার ওপর বসতে নিষেধ করতেন, কারণ ওতে বসলে মুদির মনোবৃত্তি জাগ্রত হয়। ভারতবর্ষে সাধারণত মুদিরাই ওতে বসে।

৩৩। মানুষ জ্ঞাতসারেই সসীম এবং অজ্ঞাতসারে অসীম। ঈশ্বরের অবতার জ্ঞাতসারেই অসীম ও অজ্ঞাতসারে সসীম।

৩৪। যেখানে বিজ্ঞানের শেষ, সেখানেই ধর্মের আরম্ভ। বহির্জগতে সংগ্রামের নাম বিজ্ঞান, আর অন্তর্জগতে সংগ্রামের নাম ধর্ম।

৩৫। অনন্ত প্রেমকে বিভক্ত করা যায় না বলে তাতে পক্ষপাতিত্ব থাকতে পারে না।

৩৬। পাশ্চাত্ত্য যাকে শয়তান বলে আমরা তাকে 'অহং' বলি। অহংবোধ মানুষকে ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়।

৩৭। গুরু একজন মধ্যবর্তী ব্যক্তি নন। তিনি ঈশ্বর হতে ভিন্ন। ঈশ্বরই মানবের মুক্তির জন্যে কৃপায় মানবমূর্তি পরিগ্রহ করেন।

৩৮। নির্বাসনা হওয়ার বাসনাই পোষণ করতে হয়।

৩৯। কর্তব্য করে যাও, উদ্বিগ্ন হয়ো না ও ভবিষ্যতের জন্য ভেব না। উদ্বিগ্ন হলেই বুঝতে হবে যে তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাসী নও, তিনি যে তোমার ভার নিয়েছেন তা মান না। তুমি নাস্তিক হয়ে গেছ।

৪০। যদি ঈশ্বরে তোমার প্রকৃত বিশ্বাস থাকে, তা হলেও তুমি কখনও উদ্বিগ্ন হতে পার না।

৪১। সুখ মানুষের বাইরে কোথাও নেই, সুখ তার ভেতরেই আছে।

৪২। যে ক্রমবিকাশবাদ চেতন সত্তাকে প্রথমে স্বীকার করে না, তা অসম্পূর্ণ। চেতন ব্যতীত কে প্রকৃতিকে জানবে? প্রতি চিন্তার কাজে প্রথমে প্রয়োজন চিন্তাকারীকে এবং তিনি একজন চেতন জীব। এই জন্যে যাবতীয় কিছু চেতনত্ব হতেই উদ্ভুত।

স্বামী সারদানন্দজীর কথা

১। শ্রীশ্রীঠাকুর ও মা অভেদ। সঙ্গোপাঙ্গগণ তাঁদের অঙ্গের হস্তপদাদি অবয়বের ন্যায়। মা আর ঠাকুর যে ঘরে বসেছেন, তাদের আবার ভয় কি?

২। আমাদের মা সরস্বতী, লক্ষ্মী, দুর্গা, কালী ইত্যাদি সব।

৩। শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন প্রথম শ্রুতিধর, একবার পড়লে বা শুনলেই মনে থাকত। স্বামিজী ছিলেন দ্বিতীয় শ্রুতিধর।

৪। মানুষ যেমন এক তাল মাটি নিয়ে যা ইচ্ছা তাই গড়তে পারে, ঠাকুরও মানুষের মন নিয়ে যেমন ইচ্ছা, তেমন করে দিতে পারতেন।

৫। শ্রীশ্রীঠাকুর তোমার সকল কথা ও মনের সকল ভাব শুনছেন ও জানতে পাচ্ছেন। ব্যাকুল হয়ে তাঁর কাছে যা-ই চাইবে, তা-ই পাবে। তিনি অন্তর্যামী, ভক্তের ব্যাকুল প্রার্থনা তিনি অবশ্য শুনবেন।

৬। সকলই শ্রীশ্রীমার ইচ্ছায় হচ্ছে জেনে কায়মনো-বাক্যে তাঁর শরণাপন্ন হয়ে পড়ে থাকার চেয়ে শান্তি আর কিছুতেই নেই।

৭। যখন একথা মনে স্থির আছে যে আমরা সকলে এক পরিবারভুক্ত, শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার পরিবার, তখন ভাবনার কোন কারণ নেই। তাঁদেরই ইহকাল ও পরকালের একমাত্র আপনার বলে জানবে, তা হলেই ধ্যান ধারণার সার ফল লাভ হবে। সকল বিষয়ে তাঁদেরই ওপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত ও প্রফুল্ল থাকতে চেষ্টা করবে।

৮। শ্রীশ্রীঠাকুর ও মা চিরকাল ও নিত্য আছেন এবং থাকবেন। তাঁদের ওপর নির্ভর করে থাকতে পারলেই শান্তি ও আনন্দ পাবে। আত্মসমর্পণই শ্রেষ্ঠ পূজা।

৯। স্বামিজী না বুঝলে আমরা ঠাকুরকে কিছুই বুঝতাম না। স্বামিজীর ব্যাখ্যা ছেড়ে যিনি ঠাকুরকে বুঝতে যাবেন, তিনি ঠাকুরের ভাব ঠিক ঠিক ধরতে পারবেন না। তাঁর সঙ্গে আমাদের তুলনাই হয় না।

১০। মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) নিজেই আনন্দময় পুরুষ। মহারাজের মধ্যেই ঠাকুর ও মা রয়েছেন। মহারাজের সেবা ঠাকুর ও মার সেবা বলে বিশ্বাস করবে।

১১। বাবুরাম মহারাজের কথা যত বেশী চিন্তা করবে, তত বেশী তোমাদের কল্যাণ হবে।

১২। চৈতন্য প্রকাশাত্মক, জ্যোতিও প্রকাশাত্মক, তাই ভাববার সুবিধার জন্যে চৈতন্যকে জ্যোতির্ময় চিন্তা করা হয়। ঠাকুরকে সর্বব্যাপী চৈতন্যরূপে চিন্তা করবে।

১৩। ইষ্টের সাকার মূর্তি ধ্যান ভাল না লাগে তো তাঁকে নিরাকার সর্বব্যাপী বায়ুর ন্যায় বা আকাশের ন্যায় চিন্তা করবে, আর তুমি যেন তাঁ'তে ডুবে আছ, তোমার ভেতরে বাইরে তিনি, এইরূপ মনে করবে।

১৪। ধ্যান-জপ করার যে ইচ্ছা, এ-ও তাঁর ইচ্ছা বা কৃপা। নির্ভরতাও চাই, পুরুষকারও চাই।

১৫। যখন মূর্তি ভাল না লাগবে, তখন সহস্রারে পরমাত্মারূপী ঠাকুরকে নিরাকারভাবে ধ্যান করবে।

১৬। ইষ্টমূর্তির পরিবর্তে গুরুমূর্তির ধ্যান যদি ভাল লাগে, তখন গুরুর মূর্তিই ধ্যান করবে। ইষ্ট গুরুর ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হয়েছেন।

১৭। বর্ষাকাল সাধনার উপযুক্ত কাল নয়, তখন ধ্যান করতে বসলেই ঘুম আসে। মনের চাঞ্চল্য সেই সময় বাড়ে। শীতকাল ধ্যানের উপযুক্ত সময়। ধ্যান যারা করবে, তাদের পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া আবশ্যক। ঘি, মাখন ইত্যাদি খাওয়া ভাল। অভ্যাসের ফলে জপধ্যান ভাল লাগে।

১৮। সহস্রারে ঠাকুর কেন্দ্রস্থলে বসে, আর তাঁর শিষ্যরা চার ধার ঘিরে বসে আছেন—এভাবে ধ্যান করবে।

১৯। মনকে ভগবানের ধ্যানে সম্পূর্ণভাবে একাগ্র করাকেই মনোনাশ বলে। সম্পূর্ণরূপে ভগবানে নির্ভরতাই আত্মনির্ভরতা।

২০। গুরু শক্তি, যিনি আশ্রয় দিয়েছেন, তিনি কোন কালে রুষ্ট হন না। গুরু, ইষ্ট এবং নিজেকে এক বলে জানবে। ইষ্ট ও জীবাত্মা একই জ্যোতির দুই মূর্তি। গুরু ও ইষ্ট সহস্রারস্থিত পরম শিবের প্রকাশ।

২১। পরমাত্মা যখন 'আমি ইন্দ্রিয় ও মনবিশিষ্ট'—এইরূপ অনুভব করেন, তখন তিনি জীবভাব প্রাপ্ত হন এবং সংসারের সুখ-দুঃখ ভোগ করেন।

২২। জীবাত্মার অবস্থান হৃদয়ে—অনাহত পদ্মে। অন্তঃ-করণের অবস্থান ভ্রূ-মধ্য হতে নাভি পর্যন্ত। বুদ্ধির অবস্থান মস্তকে, মনের কণ্ঠে, অহঙ্কারের হৃদয়ে এবং চিত্তের নাভিতে।

২৩। চতুর্থ ও পঞ্চম ভূমিচক্র হতে যেসব দেবদেবীর দর্শন হয়, তাকে সবিকল্প সমাধি বলে।

২৪। ব্রহ্মজ্ঞান লাভে প্রারব্ধ একেবারে নাশ হয়—এক ভাবে বলা যায়। কারণ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ঐ প্রারব্ধ দ্বারা আবদ্ধ থাকেন না। শরীর শরীরের কাজ করছে, এই বুদ্ধি তাঁর থাকে। ব্রহ্মজ্ঞের শরীর কিছুদিন পর্যন্ত আপনা হতে কাজ করে তবে পড়ে যায়।

২৫। গায়ত্রীকে দেবীরূপে ধ্যান করবে। এই বিরাট জগৎ ব্রহ্মের শক্তির খেলাতেই সমুদ্ভূত। সেইজন্য গায়ত্রীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে কোথাও বিরাট পুরুষ, কোথাও সেই বিরাট পুরুষের শক্তি—জগন্মাতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পুরুষ ও তাঁর শক্তি এক বলে ঐরূপ উভয়বিধ কল্পনায় কোন বিরোধ বা contradiction হয় না।

২৬। সংসারে দুঃখকষ্ট সকলকেই সইতে হয়। কিন্তু উহা চিরস্থায়ী নয়। শান্তি ও অশান্তি দুই-ই ঠাকুরের ইচ্ছায় জীবনে আসে আমাদের শিক্ষার জন্যে। সকল অবস্থায় ঠাকুর ও মাকে ধরে আমাদের অবিচলিত থাকতে হবে। ঠাকুর কোন্ দিক দিয়ে কার মঙ্গল করেন, তা বোঝা কঠিন।

২৭। স্বামিজী বলতেন, দেবস্বপ্ন মনের উচ্চতর অবস্থার Vision, অর্থাৎ দর্শন ছাড়া আর কিছু নয়।

২৮। স্বপ্নে আমরা আমাদের মনের এমন একটা স্তরের পরিচয় পাই, যা জাগ্রত অবস্থায় কখনো পাইনে।

২৯। আমাদের ঠাকুরের জন্মতিথির উৎসবের মত অতবড় অন্নকূট ভারতের কোথাও নেই।

৩০। ঠাকুর মঘা, অশ্লেষা, যোগিনী, ত্র্যহস্পর্শ, দিকশূল ও বৃহস্পতিবারের বারবেলা খুব মেনে চলতেন। তিনি মানতেন বলে আমরাও মানি।

৩১। ভাব ও ভাবাতীত রাজ্য পরস্পর কার্যকারণ সম্বন্ধে সর্বদা অবস্থিত, কারণ ভাবাতীত অদ্বৈতরাজ্যের ভূমানন্দই সীমাবদ্ধ হয়ে ভাবরাজ্যের দর্শন, স্পর্শনাদি সম্ভোগানন্দরূপে প্রকাশিত রয়েছে।

স্বামী অভেদানন্দজীর কথা

১। আমি তাঁকে (শ্রীরামকৃষ্ণকে) দর্শন করেছি, মানে আমি সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বরকেই প্রত্যক্ষ করেছি। আমি রামকৃষ্ণ ছাড়া কারও পায়ে মাথা নোয়াই নি। সতের বৎসর বয়স হতে ঠাকুরকেই ধরে আছি। তিনিই শক্তি, তিনিই শান্তি, তিনিই একমাত্র আশ্রয়, এ ভিন্ন আর কিছুই জানিনে।

২। শ্রীশ্রীঠাকুর অকূলের কাণ্ডারী। তিনিই আমাদের একমাত্র সহায় ও সম্বল।

৩। শ্রীশ্রীঠাকুর ও মা কালীকে অভিন্ন জ্ঞানে ধ্যান করবে। ঠাকুরের ভেতর মা কালী আছেন, একাধারে দুই বিদ্যমান। তিনি যেন মা কালীর মুখশ্রী, মা কালীর জীবন্ত মূর্তি।

৪। শ্রীশ্রীমা হলেন সরস্বতী জ্ঞানদায়িনী, আবার মুক্তিদাত্রী মহামায়া।

৫। যখন ধ্যান বা পূজা করবি, তখন মনে মনে একটা পদ্ম কল্পনা করে নিস্। তার বারোটা পাপড়িতে এক একজন ঠাকুরের অন্তরঙ্গ বসবেন, আর মধ্যে ঠাকুর। এইরূপ চিন্তা করে এক একটা ফুল দিবি। এঁরা ঠাকুরের অংশ, এঁদের পূজায় ঠাকুর সন্তুষ্ট হবেন।

৬। শ্রবণ মানে শোনা নয়, বিচার। ধ্যানের সময় বিচার অর্থাৎ জ্ঞান থাকবে। বিচারহীন ধ্যান নিদ্রারই সামিল।

৭। সমাধিই বৌদ্ধের নির্বাণ। ইহার অর্থ সর্বপ্রকার অপূর্ণতার অবসান এবং পরমানন্দ লাভ। ইহা শূন্যাবস্থা নয়, পরন্তু পূর্ণতালাভের অবস্থা।

৮। আত্মা ও পরমাত্মা একই জিনিস। জীবভাবে আত্মা, স্ব-স্বরূপে পরমাত্মা। জীবাত্মা পরমাত্মারই প্রতিবিম্ব। বিশ্বের আত্মাই ঈশ্বর।

৯। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মে কোন গুণ থাকতে পারে না, কারণ গুণ তাঁ'তে থাকলেই তো তিনি গুণের দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বেন। ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, তবুও ব্রহ্ম কোন কারণ নন্—কেননা, ব্রহ্ম স্বরূপত নির্গুণ ও নির্বিশেষ; তাঁ'তে মায়ার লেশমাত্র নেই। 'কারণ' শব্দটাই আপেক্ষিক। ব্রহ্ম কারণরূপ গুণের অতীত। আমরা নির্গুণ ব্রহ্মে কারণরূপ ধর্ম আরোপ করে থাকি, যেহেতু জগৎটাকে দেখি। ব্যবহারিক সত্য মানে জগৎটা যতক্ষণ দেখছ ও তার ব্যবহার করছ, ততক্ষণই সত্য। ব্রহ্মজ্ঞানের আগে পর্যন্ত জগতের অনুভব হয় বলে একে

আপেক্ষিক সৎ বলা হয়। পারমার্থিক অর্থাৎ ব্রহ্মের দিক দিয়ে জগৎ অবাস্তব।

১০। 'একোঽহম্ বহু স্যাম্'-ভাবে তিনি প্রথমে যেমন বহু হয়েছিলেন, সে রকম ভাবে তিনি অনন্তকাল বহু হয়ে লীলা করবেন। লাখ লাখ সৌরজগৎ তিনি প্রতি মুহূর্তে সৃষ্টি করতে পারেন, তাঁর কি কখনো সৃষ্টি লোপ পেতে পারে?

১১। স্বপ্নে সত্য বোধ হওয়ার ন্যায় যতবার ভ্রমবশত জগৎটা সত্য বলে বোধ হয়, ততক্ষণই জগৎ ব্রহ্মের শক্তি বা বিকাশ। কিন্তু জ্ঞান হলে যাঁর বিকাশ, তাঁকেই সত্য বলে স্থির ধারণা হয়।

১২। জড় নিত্য জ্ঞেয়স্বরূপ বিষয়, আর চৈতন্যময় আত্মা নিত্য জ্ঞাতাস্বরূপ বিষয়ী। Spirit বিষয়ের দ্রষ্টা, কর্তাস্বরূপ; matter সর্বদা দৃষ্ট কর্মস্বরূপ। জ্ঞাতা আত্মা বা বিষয়ী আছে বলেই জ্ঞেয় বিষয় বা অনাত্মপদার্থের বিদ্যমানতা সম্ভবপর। জড় হতে কখন জ্ঞাতার উৎপত্তি হতে পারে না। জ্ঞেয় বিষয় পরমার্থ তো এক এবং জ্ঞাতা বিষয়ীও একটিমাত্র, ক্ষুদ্র জীবাত্মা তাঁরই ক্ষুদ্র প্রতিবিম্ব বা অংশরূপে প্রকাশমান হচ্ছে। বিশ্বাত্মা অদ্বিতীয়, অনন্ত সত্তাস্বরূপ সমুদ্র, যাতে অসংখ্য আবর্তের ন্যায় ব্যক্তিগত জীবাত্মাসমূহ বিরাজ করছে।

১৩। অসীম, অনন্ত ব্রহ্ম-সত্তাই নিখিল বিশ্বের জড় ও চেতন—এই দুই ভাবের মূলে বিদ্যমান। ইনি বিশ্বের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। যদ্যপি ইনি এক, তথাপি ইনি এঁর

সঙ্গে অভিন্নভাবে অবস্থিতা অনির্বচনীয়া মায়াশক্তির প্রভাবে বহুরূপে প্রতীয়মান হন। এই-ই বেদান্তের অদ্বৈতবাদ।

১৪। অসীম ও অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন ও সমস্বরূপা বলেই বিশ্বব্যাপিনী শক্তি চৈতন্যস্বরূপিনী।

১৫। ভগবান সৃষ্টি করছেন, আবার লয় করছেন, এই evolution and involution ঘড়ির pendulum দোলার মত অনাদিকাল হতে দুলছে। এই ভাবটি জনসাধারণকে বোঝাবার জন্যে শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন বা দোল।

১৬। হাটের মাঝে বসে যে সমাধিস্থ হতে পারে, সেই-ই বড় সাধু।

১৭। কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত না হলে সমাধি হয় না। কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ ও সমাধি একই কথা।

১৮। মুক্তি অর্থে আত্মদর্শন, ভূতে ভূতে আত্মদর্শনই মুক্তি। 'আমি' কে জানতে পারলেই ঈশ্বরলাভ হল।

১৯। অবতার পুরুষদের সর্বদাই আত্মজ্ঞান থাকে, মন সর্বদাই সমাধিস্থ থাকে। সাধারণ মানুষের আত্মজ্ঞান থাকে না।

২০। গুরু, ইষ্ট এক ও অভিন্ন, ভিন্ন ভাবতে নেই।

২১। গুরুস্থান সকল তীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

২২। সকাম ভাবে আরাধনায় কোন ত্রুটি হলে দোষ হবে, ভক্তির আরাধনায় কোন ত্রুটি হলে কোন দোষ হবে না; কেননা ভক্তের সাধনা নিষ্কাম।

২৩। আপনার ভেতর ঈশ্বরকে পেলে বাইরেও তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়।

২৪। তুমি দাস, তিনি প্রভু। তাঁর সংসার, তুমি প্রতিনিধিমাত্র। তিনি তোমায় দিচ্ছেন, তাই তুমি পাচ্ছ; তা হলে দেখবে কিসের অভাব? যাঁর সংসার, তিনি অভাব ও ভাব দেখবেন, তোমার তাতে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। যাঁর অভাব তিনি বুঝবেন। তুমি তোমার কাজ কর, আত্মমোক্ষার্থে যত্ন কর।

২৫। প্রকৃত দর্শন জ্ঞানবৃক্ষের ফুল ও ধর্ম ওর ফল।

২৬। একত্বের প্রকাশই প্রেম।

২৭। মায়া অর্থে শূন্য নয়, মায়া ব্রহ্মের শক্তি, যার সত্তা আপেক্ষিক।

২৮। আত্মার বিজ্ঞানই ধর্ম।

২৯। শাস্তি ও পুরস্কার আমাদের কৃতকর্মের প্রতিক্রিয়া।

৩০। জড়ের অদৃশ্য দিকটাই মন, মনের দৃষ্ট দিকটাই জড়।

স্বামী অদ্ভুতানন্দজীর কথা

১। আমার মা (শ্রীশ্রীমা) চিন্ময়ী, আমি সদা-সর্বদা তাঁর দর্শন পাব। কৃপা করে মা অহরহঃ আমায় সূক্ষ্মভাবে দর্শন দিচ্ছেন, আমাকে আর তাঁর স্থূল শরীর দেখতে হয় না। তিনি যে স্বয়ং লক্ষ্মী।

২। একখানা ঠাকুরের ছবি কাছে রেখে দেবে। কাম-কামনাগুলো এলেই সেখানাকে চোখের সামনে রাখবে, তা হলে আর ইন্দ্রিয়গুলো এধার ওধার করতে পারবে না। সেই ছবি দেখতে দেখতে তোমার মনের কাম-কামনা সব চলে যাবে। তাঁর

ওপর মন থাকলে তবে ওগুলো যায়। তাঁ'তে মন থাকাই প্রধান। যার মন তাঁ'তে থাকে তার আবার ভাবনা কি ?

৩। তিনি (ঠাকুর) আদর্শ গৃহী, আদর্শ সন্ন্যাসী, আদর্শ গুরু, আদর্শ শিষ্য। তিনি শাক্তের আদর্শ, বৈষ্ণবের আদর্শ, শৈবের আদর্শ, রামভক্তের আদর্শ, বেদান্ত-সাধকের আদর্শ। আবার তিনি খৃস্টান, মুসলমানেরও আদর্শ।

৪। শ্রীগুরুতে যার ঠিক ঠিক বিশ্বাস আছে, তার অনিষ্ট হবার যো নেই। গুরুর কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়। গুরু, ইষ্ট একই জানবে। গুরুই সচ্চিদানন্দ। যে ভগবানকে দেখেছে, সে-ই গুরু হতে পারে।

৫। কৃপা করবার মালিক দু'জন—এক গুরু সচ্চিদানন্দ, আর গুরুর গুরু সচ্চিদানন্দ।

৬। নামই শক্তি, নামী তো দেওতা। শক্তির সাধনা না করলে দেওতাকে পাওয়া যায় না।

৭। ঠিক ঠিক যদি নাম নিতে পার, তা হলে নামের শক্তি ঘুমের কালেও কাজ করতে থাকবে। যে নাম করতে জানে, সে নিদ্রা, জাগরণ, সুষুপ্তি—সব অবস্থায় নাম জপতে থাকে। ঘুমের সময় শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ যেমন চলতে থাকে, তেমনি মনের মধ্যে নামের কাজও চলতে থাকে। মনে স্বপ্ন উঠতে দেয় না। আর যদিই বা ওঠে তো ঘুম থেকে সাধককে জাগিয়ে দিয়ে নামই রক্ষা করে। এমনি করে দিনে রেতে নামের শক্তি সাধককে বাঁচাতে থাকে। যত দেহ-মন শুদ্ধ, পবিত্র হতে থাকবে, তত ভেতরের গরদাগুলো, যা হাজার হাজার জন্মের

সংস্কারে গোপন ছিল, সেইগুলো বেরিয়ে আসবে। বেরিয়ে এসে নামের সাথে যুঝতে থাকবে। যে নামের তাপে তারা বেরিয়ে আসে, সেই নামের তাপে তারা মনের কিল্লা থেকে ভেগে যেতে বাধ্য হয়। নামের শক্তির কাছে তারা পারবে কেন?

৮। একমাত্র নামের শক্তিতে মনের ধর্ম পালটে যায়। মনের সঙ্কল্প-বিকল্পের ঢেউগুলোতে বুঝতে পারা যায়, মনের কাজ চলেছে। মনে যখন ঢেউ থাকে না, তখন মন নিস্‌পিওর (অধিকতম পবিত্র) হয়। সেই নিস্‌পিওর মনে ভগবানের শক্তি নামতে থাকে। তখন সৎবস্তুকে চেনা যায়।

৯। মনে যে ভাব উঠবে, সেই ভাবের বিপরীত ভাবকে মনে মনে চিন্তা করবে। ঠিক ঠিক বিচার করতে পারলে মনের এমনি অবস্থা হয় যে, ক্রোধের সময় ক্ষমাকে, লোভের সময় ভগবানকে, হিংসার সময় অহিংসাকে মনে পড়ে। এই ভাবের বিচার কিছুদিন চালাতে পারলেই মন আপনা আপনি স্থির হয়।

১০। সাধুসঙ্গে মানুষের মন যেমন পবিত্র হয়, তেমনি গঙ্গাতীরে বসে ধ্যান করলে মানুষের মন পবিত্র হয়ে যায়। গঙ্গার ঢেউ দেখতে দেখতে নিজের মনে ঢেউ কখন থেমে যাবে, জানতেও পারবে না।

১১। গঙ্গাতীরে বাস, গঙ্গাজল খাওয়া খুব ভাল।

১২। ভোগই দুঃখের হেতু, ত্যাগই সুখের হেতু। ভোগের পাতকূয়া থেকে মনকে তুলতে হলে ত্যাগের দড়ি ধরে ওঠাতে হবে।

১৩। বিচার জাগ্রত রাখাই সবচেয়ে বড় তপস্যা।

১৪। ধ্যানে একই ইষ্টের মূর্তি নানা দেবদেবীর রূপ ধরে আসেন। সবই ইষ্টের লীলা। রূপ বহু হলে কি হবে? স্বরূপে তো কোন গণ্ডগোল নেই।

১৫। ভাবে সাধক অবাক হয়ে আনন্দের খেলা দেখতে থাকে। সেখানে সাধক নিজে দেখে আনন্দকে। বাকী সমাধিতে সাধক নিজে আনন্দময় হয়ে যায়, দেখবার আর কেউ থাকে না। এখানকার আনন্দ সব মায়ার ব্যাপার। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তিকে ঘিরে মায়ার ব্যাপার চলছে; তুরীয়ের আনন্দ একেবারে নির্মায়া—ব্রহ্মানন্দ।

১৬। শান্তি কেমন জান? আপনাতে আপনি ভরপুর। বাইরের কোন দুঃখ কষ্টে মনের ভাব টলবে না—এমনি যে অবস্থা, তাকেই শান্তি বলে। ভেতরে বাইরে এই শান্তিতে ভরপুর না হলে সাধনপথের দরজা খোলে না।

১৭। তত্ত্বের মীমাংসার জন্যে তত্ত্বদ্রষ্টা মহাপুরুষদের জীবন দেখতে হয়: তা হলে তত্ত্বের গূঢ় অর্থ সহজে বোঝা যায়। শঙ্করাচার্যের বই পড়ে মায়াতত্ত্ব সম্বন্ধে ঠিক বুঝবেন না, তাঁর জীবন দেখেই বুঝবেন। যিনি সব মায়া বললেন, তিনিই কিনা নানা দেবদেবীর স্তোত্র লিখলেন, বিশ্বনাথের পূজা করলেন, চারধাম প্রকাশ করলেন। মায়ার সম্বন্ধে তিনি যা বুঝেছিলেন, ভাষায় তা প্রকাশ করতে তিনি পারেন নি; আচরণের মধ্যে তা বুঝিয়ে গেছেন।

১৮। মায়ার চালনার চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবকে

ভগবানের কাছে পৌঁছে দেওয়া। মায়া একদিকে যেমন জীবকে ভোলাচ্ছে, তেমনি আর একদিকে জীবের চৈতন্য এনে দিচ্ছে। একেবারে ব্যালান্স (Balance) রেখে নিষ্কামভাবে কাজ করছে। মায়া দু'ধারই রেখেছে। সুখ রেখেছে, দুঃখ রেখেছে, পাপ রেখেছে, আউর পুণ্য ভি রেখেছে। জীবকে শিক্ষা দেবার জন্যই তো দু'ধার রেখেছে! মায়া যদি মানুষকে ভুল বোঝাতে চাইত, তা হলে একটা দিক রাখত, দু'ধার রাখত না। দু' ধার রেখেছে বলে মায়া ভুলিয়েও ভোলায় না। তবে বড় ঘোরায়। ভুগে ভুগে যখন মায়ার ব্যাপার বুঝতে পারবে, তখন মায়া আর জীবকে বাধা দিতে পারবে না। তার সৎ-শক্তিতে জীব উদ্ধার হয়ে যাবে। এই জন্যে মায়াকে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী বলে।

১৯। সৃষ্টির ব্যাপারে কারণ আউর কার্য দুই-ই আছে। তিনি বলতেন, 'কার্য কারণেরই বিকার'। বাঁকী, সৃষ্টির সুরুতে কি ছিল? সেখানে কারণ আউর কার্য দুই এক সাথে মিশে ছিল। তখন তাদের মধ্যে কোন ফারাক ছিল না। কার্য ও কারণের মধ্যে এই ফারাক কেমন করে যে এলো সে কথা বলা যায় না, বাঁকী এলো। শুধু বলতে পারি মায়াশক্তি এই অঘটন ঘটিয়ে দিল। কার্য আউর কারণের মধ্যে মায়াই এই ফারাক করে দিল। এই মায়া হলো আবার তাঁরই ইচ্ছাশক্তি। তাঁরই মায়ায় জগৎকারণ হলো মায়াধীশ, আর জগৎকার্য হলো মায়াধীন। ওদেরকেই শাস্ত্রে পুরুষ আউর প্রকৃতি বলেছে। পুরুষ-প্রকৃতি ভেদ কেমন জান? থামা আউর

চলার যেমন ভেদ আছে, তেমনি ভেদ। যে বস্তু থেমে আছে, সেই বস্তুই চলে। থামলেই পুরুষ, আর চললেই প্রকৃতি। মায়ার শক্তিতেই দেশ আর কালের সৃষ্টি হয়েছে। দেশে ও কালে কর্মের খেলা চলছে।

২০। তীর্থবাস করলে সাধুসঙ্গের ফল পাওয়া যায়। তীর্থ তপস্যার স্থান, সেখানে সাধন-ভজন করলে অল্পতেই সিদ্ধ হওয়া যায়।

২১। কাশীবাস করলে অন্য তীর্থের প্রয়োজন হয় না।

২২। ৺জগন্নাথদেব—এমন তীর্থ আর কোথায় পাবে? সব একাকার, জাতিভেদ নেই। একি কম কথা? এমন পবিত্র স্থান জগতে আর ক'টা আছে?

২৩। প্রসাদ ধারণে মনের পবিত্রতা বাড়ে।

২৪। বক্তৃতায় যে কাজ হয়, তার অপেক্ষা বেশী কাজ হয় সদ্‌গ্রন্থ পাঠে। কারণ বক্তৃতায় বক্তার সঙ্গে শ্রোতার ক্ষণিক যোগ হয়, কিন্তু গ্রন্থে লেখকের সঙ্গে পাঠকের সংযোগ আরো ঘনিষ্ঠ ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করলে সাধুসঙ্গের ফল হয়।

২৫। যারা প্রকৃত ধ্যানী তাদের চোখের চাউনি আলাদা, চলন আলাদা, শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি আলাদা, মেজাজ আলাদা। তাদের দেহের গঠনও বদলাতে থাকে।

২৬। অপবিত্র হলে লোকের দোষগুলো নজরে পড়ে, পবিত্র হলে লোকের গুণগুলো নজরে পড়ে!

২৭। 'হামার ভগবান', 'ভগবানের হামি' আর 'হাম্‌নে

ভগবান'—এই তিন ভাবের মধ্যে 'ভগবানের হামি'টাই ভাল। ওতে অহঙ্কার বাড়তে পারে না।

২৮। পবিত্র হও, পবিত্র না হলে ভগবানকে বুঝতে পারবে না। সৎ না হলে স্বরূপকে জানতে পারবে না।

২৯। ধর্ম হচ্ছে আনন্দের ব্যাপার। যদি আনন্দই না মিললো, তো উপোস করা মিছে। ক্ষিদেয় শরীর জীর্ণ হয়ে পড়লো, মন খিঁচড়ে রইল, তা হলে পূজো করবে কে? তিনি বলতেন, 'কুছু খেয়ে নিয়ে পূজো করায় দোষ হয় না।'

৩০। তাঁর প্রকাশ যখন যে মানুষের মধ্যে নামে, তখন সে লোক তাঁকে প্রচার করবার শক্তি পায়।

৩১। আসলি সাধুর জামার পকেট থাকে না।

৩২। মুসলমানদের ধর্মের ওপর একটা টান আছে, সেই টানে তারা সব কাজ ফেলে নমাজ পড়তে যায়।

৩৩। এ সংসারে ভগবান ঐশ্বর্য দিয়ে জীবকে পরীক্ষা করে থাকেন। যেখানে দেখবে যে ভগবান টাকাও দিয়েছেন, আবার তার দানেরও ইচ্ছে দিয়েছেন, সেখানে জানবে যে তাঁর দয়া আছে।

৩৪। যার মন যত ভগবান থেকে দূরে সরে যায়, সে তত গরীব। যে যত ভগবানের দিকে চেয়ে থাকে, সে তত ধনী, তত সুখী। টাকা-পয়সার ঐশ্বর্য দিয়ে লোকের গরীবানার মাপ করো না। জীবের গরীবানার মাপ হচ্ছে ভগবানকে নিয়ে।

৩৫। নদীর জল সাগরে মিশলেই তার কর্মচক্রের শেষ হয় না। আবার তাকে মেঘ হয়ে আকাশে উড়ে যাবার কাজে

লাগতে হয়। তেমনি সাধককে হারিয়ে যাওয়ার সাধন করতে হয়, আবার খুঁজে পাবার সাধন করতে হয়। তাই সাধনার শেষ নেই। বুড়ী ছোঁয়াও আছে, আবার ছুঁয়ে খেলাও আছে। এ খেলায় তিনিই সব সেজেছেন। তিনি জীব হয়ে সাধন করছেন, মুক্ত হচ্ছেন, আবার লীলায় এসে কাজ করছেন। এ অচিন্ত্য ব্যাপার!

৩৬। মানুষ কি ম্লেচ্ছ হয় রে? কর্মই মানুষকে ম্লেচ্ছ করে।

স্বামী তুরীয়ানন্দজীর কথা

১। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন গভীর ভক্তি ও ত্যাগের জীবন্ত বিগ্রহ। বৈদান্তিক সত্যের মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনিই সেই আদ্যাশক্তি।

২। জগন্নাথদেবই রামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এইজন্যে ঠাকুর পুরীতে যেতেন না ও বলতেন, 'পুরী গেলে শরীর ত্যাগ হবে।'

৩। তাঁকে ফটোতে প্রত্যক্ষ করে সত্যজ্ঞানে তাঁর সেবা-পূজা করে যাও। দেখবে—সত্যই তাঁর ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে যাবে।

৪। তাঁকে স্বপ্নে দেখা যে পরম কল্যাণকর, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

৫। মা ব্যতীত সবই দুঃখময়। মাতৃহীন জীবন কি কষ্টকর! তাঁকে পেলে জীবন মধুময় হয়।

৬। আমাদের ভাগ্যে যা ঘটে, তা আমাদের মঙ্গলের

জন্যে মা-ই করেন। মা দয়া করে দুঃখ দেন, এতে আমাদের কর্ম ক্ষয় হয়। মার ইচ্ছা না হলে আমরা কিছুই করতে পারি না। কোন রকম মতলব করো না, মাকে মতলব করতে দাও। তাঁর মতলবই ঠিক হয়। তাঁর সম্মতি না পেলে মানুষের মতলব সবই বৃথা। কি ঘটবে, তা তিনিই জানেন। ভবিষ্যৎ তাঁর কাছে খোলা বইয়ের মত। ঠিক জেন যে, মার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। তাঁ'তে বিশ্বাস কর, কেবল মারই চিন্তা কর। অকপটভাবে তাঁকে ভালবাসতে চেষ্টা কর। তাঁ'তে আত্মসমর্পণ কর। তিনি যেমন ইচ্ছা করেন, তোমাকে নিয়ে তিনি তাই করুন।

৭। যখন আমরা মায়ের সান্নিধ্যে থাকি, তখনই সব মঙ্গল।

৮। তিনি (মা) অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন।

৯। মা স্বয়ং তোমায় রক্ষা করবেন, আর চিরকাল রক্ষা করে আসছেন। তিনি ধরে না থাকলে, না আগলালে কি তুমি এতদিন রক্ষা পেতে? এখন মাকে নিয়ে সম্বন্ধ, অন্য সম্বন্ধ নেই। মায়ের সন্তান হও, তিনি তাঁর সন্তানদের সাহায্য করার জন্যে সব সময় প্রস্তুত। মার কাছে প্রার্থনা কর, সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমার সকল দুঃখকষ্টের কথা মাকে জানাও, তিনিই সব দুঃখ দূর করবেন, অর্থাৎ তোমাকে তাঁর কাছে টেনে নেবেন। জাগতিক বিষয় ভুলে যাও। সুদিনে, দুদিনে আমরা যেন মাকে না ভুলি। আমরা বুঝি আর না বুঝি, মা-ই আমাদের একমাত্র আশ্রয়। তাঁর চরণে একবার আত্মসমর্পণ করলে আমাদের সম্বন্ধে চিন্তা করবার আর কি

অধিকার আমাদের আছে? মাকে কি আত্মসমর্পণ কর নি? তবে আর নিজের কথা ভাব কেন? মা ছাড়া অন্য কারো দিকে তাকিও না। তাঁর শরণাগত হয়ে মনপ্রাণ তাঁ'তে অর্পণ করে যেখানে থাক, তিনিই রক্ষা করবেন, নচেৎ আপনি আপনাকে রক্ষা করা বড় শক্ত।

১০। তাঁর অনুগত হয়ে তিনি যেমন রাখেন তা'তেই সন্তুষ্ট হয়ে জীবনের গোটাকয়েক দিন কাটিয়ে দেওয়া বই তো নয়। তিনি ইহ-পরকালের সর্বস্ব। এ সংসারে এক সারবস্তু তিনি। উঠতে, বসতে, খেতে, শুতে তাঁকেই মনে করতে হবে। ক'টা দিন কোনরূপে তাঁকে না ভুলে তাঁর নেশাতে বিভোর হয়ে কাটিয়ে দেওয়া। কোনরূপে চলে গেলেই হল, প্রভুর কৃপায় অচল হবে না।

১১। তাঁ'তে আত্মসমর্পণ করতে পারলেই সকল গোল মিটে যায়, মানুষ নিশ্চিন্ত হতে পারে। খুব প্রাণভরে তাঁকে ভালবাসতে পারলেই অন্য সাধনার আবশ্যক নেই।

১২। নিজে দুর্বল হলেও যাঁর শরণ নিয়েছ, তিনি সর্বশক্তিমান। সুতরাং তাঁর বলে আপনাকে বলী মনে করবে। তিনি ভিন্ন আর কেউ নেই, এটা স্থির ধারণা হলে হৃদয়ে মহাবল প্রবেশলাভ করবে।

১৩। তিনি জানেন, কার পক্ষে কি উত্তম ও সেইমত ব্যবস্থাও করেন। মধ্যে হতে আমাদের মনোমত যা-তা একটা চেয়ে বসে গোল করে ফেলি বই তো নয়। তিনি যেমন রাখেন, তা'তেই রাজি থাকতে পারলেই উত্তম।

১৪। প্রভুর ভাব যত অধিকভাবে হৃদয়ে ধারণ করতে পারবে, সংসারের ভাব ও চিন্তা ততই দূরে চলে যাবে।

১৫। প্রভু যেখানে রাখেন সেই মঙ্গল। যেখানে রাখবেন, যেমন রাখেন, যেমন করান, সে তাঁর ভার। তুমি তাঁকে না ভুললেই হল। তিনি মহা অমঙ্গলের মধ্যে দিয়েও মঙ্গলের সৃষ্টি করে থাকেন, কারণ তিনি মঙ্গলময় ও করুণাসিন্ধু।

১৬। যেখানে থাক না, প্রভুকে না ভুললেই হল। তাঁকে নিয়েই কথা। জায়গায় কি আছে? তাঁকে নিয়েই সব। প্রভুকে অবলম্বন কর, তাঁকেই আপনার কর, তাঁকে ভুলো না।

১৭। সৎসঙ্গ অবশ্য অত্যন্ত প্রয়োজন, কিন্তু তাও তাঁকে মনে করায় বলে; নচেৎ সৎসঙ্গের অন্য আর কি বিশেষত্ব?

১৮। গীতা সুবিধামত নিত্য পাঠ করলে চিত্তশুদ্ধি হয়ে থাকে। যে কেউ শ্রীগীতার সেবা করবেন, তিনি ধ্রুব সন্দেহমুক্ত হবেন।

১৯। ভজনই সার। খুব ভজন কর, মন তাঁ'তে মগ্ন হোক। ভজনের জন্যে মন ভাল থাকার প্রয়োজন, শরীর ভালর তত দরকার নেই। মন দিয়ে ভজন করতে হয়। যদি শুদ্ধ কর্ম করা যায়, তা হলেই মন ভাল থাকে, তা শরীর যেমনই থাকুক না। শরীর তো একটু একটু করে রোজই নাশের দিকে চলেছে, তা তো আর কেউ বন্ধ করতে পারবে না। মন কিন্তু যতদিন না পূর্ণজ্ঞান লাভ হচ্ছে, ততদিন থাকবে ও বারবার শরীর ধারণ করাবে। অতএব মনের শুদ্ধির জন্যে যত্ন করাই হচ্ছে আসল কাজ।

২০। এই মন বিষয় ছেড়ে ভগবানে অনুরক্ত হলেই শুদ্ধ মন হয়। শুদ্ধতার দিকে বিশেষ নজর রাখবে। শুদ্ধ জীবন অতীব দুর্লভ।

২১। কখন আপনাকে নিরাপদ মনে করবে না, সতত ভগবানের শরণাগত থাকবে। সর্বদা সৎচিন্তা ও সদালাপ করবে।

২২। যে প্রকৃতিতে ভোগেচ্ছা অত্যন্ত প্রবল, তাকে কিছু ভোগ দিতেই হবে। তবে ভোগের সঙ্গে সঙ্গে সদসৎ বিচার থাকার বিশেষ প্রয়োজন, কারণ ভোগের দ্বারা তৃপ্তি তো হবার নয়।

২৩। যেমন অগ্নিতে ইন্ধন না থাকলে উহা আপনি নির্বাণ হয়ে যায়, সেই রকম কাম হলে ওর ভোগ না করলে আপনিই উহা শান্ত হয়ে থাকে।

২৪। সুখ, দুঃখ কিছুই চিরস্থায়ী নয়। এই দু'য়েরই পারে যেতে হবে। তা কেবল তাঁর দিকে দৃষ্টি রাখলেই হবে, অন্য উপায়ে হবার নয়।

২৫। নিজের মধ্যে ভাব হওয়া চাই, তা নইলে কোন ভাব বোঝা যায় না।

২৬। ধ্যান, ধারণা নিত্য অনলস হয়ে অভ্যাস করবে।

২৭। ঘটনা-পরম্পরা প্রভুস্মরণ হতে মনকে বিচ্ছিন্ন করে, তথাপি অবহিত হয়ে স্মরণ-অভ্যাস দৃঢ় করতে উপেক্ষা করো না। যত বাধাবিপত্তি, ততই অধিকতর যত্ন ও প্রয়াস অবলম্বন প্রয়োজন।

২৮। যা বিষয়াসক্তি, তাই-ই মলিনতা, আর যা ঈশ্বরে আসক্তি, তা-ই পবিত্রতা।

২৯। বিশ্বাসই প্রকৃত বন্ধু ও রক্ষক।

৩০। সত্যের দ্বার উন্মুক্ত করবার চাবি হচ্ছে ধ্যান। বাক্য দ্বারা নয়, অধ্যয়ন দ্বারা নয়, একমাত্র ধ্যানের দ্বারাই সত্য অনুভূত হয়। ধ্যান সহায়ে আত্মজ্ঞান লাভ করতে হয়। ধ্যানের দ্বারা মায়াজাল ছিন্ন হয়।

৩১। কুলকুণ্ডলিনী হচ্ছেন আত্মার জ্ঞানশক্তি।

৩২। গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ পারমার্থিক পিতাপুত্র-ভাব।

৩৩। ঠিক ঠিক ভগবানে নির্ভরের নামই মুক্তি। জীবমুক্তি সুখভোগ করার জন্যেই আত্মার দেহধারণ, নচেৎ নিত্যমুক্ত আত্মার সংসার কামনা করে জন্মধারণ আদৌ সঙ্গত নয়।

৩৪। অদ্বৈতভাব আনবার জন্যেই দ্বৈতভাবের উপাসনা। ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধটা পূর্ণভাবে করতে পারলে দ্বৈত আপনা-আপনি ছুটে যাবে, তখন কেবল পরমাত্মাই থেকে যাবেন।

৩৫। প্রাণটা যত তাঁ'তে থাকবে, তিনিও ততই প্রাণে থাকবেন। কল্পনা পাকা হলেই সাক্ষাৎকার হয়।

৩৬। স্বসংবেদ্য লক্ষণ: ভিতর হতে নির্ভরতার ভাবের উদয়, তাঁর কৃপার উপলব্ধি, তিনি যে সর্বদা রক্ষা করছেন তার সাক্ষাৎকার, মন হতে অসৎ চিন্তার তিরোধান, সদ্ভাবের স্ফুরণ ও প্রাণে শান্তির উদয়। পরসংবেদ্য লক্ষণ: অন্যে দেখে তিনি নিশ্চিন্ত ও শান্ত, সকলে প্রেমপূর্ণ ও সদাসন্তুষ্ট।

৩৭। দ্বৈত ও অদ্বৈত, সবই মনকে নিয়ে। 'আমি আত্মা'—

ইহা উপলব্ধি করতে পারলে অদ্বৈত আপনা হতেই সিদ্ধ হয়। আর শরীর মন থাকলেই দ্বৈত। দেহ থাকতেও অদেহবোধ লাভ করাই মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য। একেই জীবন্মুক্তি বলে।

৩৮। ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবী সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দেরই ভিন্ন ভিন্ন শক্তিপ্রকাশিত মূর্তি।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর কথা

১। ঠাকুর ও মাকে অভেদ ভাবে দেখবে। ঠাকুরের কৃপা না হলে মাকে পাওয়া যায় না, আবার মা'র কৃপা না হলে ঠাকুরকে পাওয়া যায় না।

২। ঠাকুর যেন নারায়ণ, মা যেন লক্ষ্মী। ঠাকুর হলেন রাম ও কৃষ্ণ, মা হলেন সীতা ও যোগমায়া।

৩। মার কাছে শক্তি চাইতে হয়, শক্তি না হলে কোন কাজ হয় না। ঠাকুরের কাছে শ্রদ্ধা ভক্তি চাইতে হয়।

৪। ঠাকুরের মধ্যে কালী কৃষ্ণ শিব প্রভৃতি সব দেবতা আছেন।

৫। ঐ যে ছবি দেখছ, উহা ষট্‌চক্রভেদের মূর্তি। তিনি সব চক্র ভেদ করে আনন্দেতে ডুবে আছেন।

৬। ঠাকুর সূর্যের দিকে একদৃষ্টিতে তিন দিন ক্রমান্বয়ে উদয়াস্ত তাকিয়ে রইলেন। তিনদিনের শেষে প্রাতে নবোদিত সূর্যের মধ্যে মা কালীকে দেখতে পেলেন!

৭। তাঁর যে কি অদ্ভুত মোহিনী শক্তি ছিল, তা বলে বোঝাবার নয়। বাইরে দেখতে সাধারণ মানুষের মতন, কিন্তু

বাবা! ও যেন কাঁচাখেকো দেবতা! স্বামীজী, মহারাজ প্রভৃতি সকলকে যেন একেবারে জ্যান্ত গ্রাস করে ফেলেছিলেন।

৮। তাঁকে দেখলেই মনে হত যেন ভেতরকার পবিত্র ভাবসমূহের Living Embodiment. তাঁর সর্বশরীরে spiritual current বিদ্যুতের মতন সদাই খেলতো।

৯। ঠাকুরের নামের চাইতে আমি মায়ের নামে বেশী জোর পাই। মাকে ডাকবে। ঠাকুর বড় দুষ্টু, একেবারে ঠিক না হলে তাঁর কৃপা হয় না। মা বড় ভাল। ঠাকুর মাকে দেখিয়ে আমাকে বলেছিলেন, 'এঁকে ডাকবি।' তবেই আমার সব হয়ে গেল।

১০। ঠাকুরের ধ্যান করলে বা তাঁর নাম করলে মনের হীনভাব কোথায় পালিয়ে যায়, মন উচ্চস্তরে উঠে যায়; কুণ্ডলিনী জেগে ওঠে।

১১। ঠাকুরের সামনে সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করবে। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম মানে সর্বতোভাবে তাঁর চরণে শরণ নেওয়া। ওতেই সমস্ত হয়ে যাবে।

১২। ঠাকুরকে ডাকার মানে কি, না ঠাকুরের গুণের কতকাংশের অধিকারী হওয়া। যে যার চিন্তা করে, সে তার গুণ পায়।

১৩। ঠাকুরকে যখন ধরেছ ঠিক পথই ধরেছ।...তাঁর নাম জপ করে যাও, শান্তি পাবে।

১৪। প্রার্থনা করবে—ঠাকুর, আমি তোমার শরণাগত, তোমার আশ্রিত। আমার হাত ধরে রেখো, আমায় ভুলে যেয়ো না। শেষের দিন, যেদিন চারিদিক অন্ধকার দেখবো, সেদিন তুমি এসে হাত ধরো—দেখো, যেন ভুলে থেকো না।

১৫। ঠাকুরকে সদাসর্বদা মনে রাখতে পারলে, তাঁকে ক্ষণমাত্র না ভুলে গেলেই তাঁর কাছে থাকা হল।

১৬। যে যত পবিত্র হবে, ঠাকুর তার কাছে ততই প্রকাশিত হবেন।

১৭। শ্রেষ্ঠ সমাধান হচ্ছে—রাতদিন মাকে চিন্তা করা, সর্বান্তঃকরণে তাঁর শরণাগত হওয়া আর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা যে, ইন্দ্রিয়ের বশে কিছুতেই থাকব না, একেবারে দমন।

১৮। ধ্যান ধারণা যা সয়, তাই করাই ভাল; জোর করে বেশী করতে গেলেই মাথা গরম হয়। সব রকমই করা গেল, এখন ঠাকুর আর মা-ই সম্বল। তাঁদের ওপর নির্ভর করে পড়ে আছি। এই মনে হচ্ছে, যেন তাঁদের নাম করে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারি। আমাদের আর কি আছে? ঠাকুর মা যেমন করাচ্ছেন, তেমনিই করছি।

১৯। স্বামীজীকে শিবজ্ঞানে পূজা করবে। স্বামীজী বাইরে এত জ্ঞান, কর্ম প্রচার করতেন, কিন্তু ভেতরে ছিল পুরোপুরি ভক্তির ভাব।

২০। মহারাজের কৃপা পেলে ঠাকুরের কৃপাই পাওয়া হবে।

২১। বেলুড়মঠে মা অন্নপূর্ণা সাক্ষাৎ বিরাজ করছেন। এখানে তিন চার দিন নিরিবিলিতে থাকলে ও একান্ত মনে জপ করলে supernatural অনুভূতি হয়। ও বড় জাগ্রত স্থান।

২২। মনে যত পবিত্রতা আসবে, অমনি ভূমা আনন্দের আস্বাদ পাবে। আনন্দ মানে এ নয় যে দুঃখ আসবে না। সংসারের দুঃখে ও সুখে বিচলিত না হয়ে থাকা।

২৩। নিঃশ্বাসের সঙ্গে ঈশ্বরকে স্মরণ করায় আমাদের অন্তর্দেশ ও প্রশ্বাসের সহিত তাঁকে স্মরণ করায় বহির্দেশ পবিত্র হয়।

২৪। সংসারটা যেন দিন। সংসাররূপ দিনের অবসান যখন হবে, তখন রাতে ধ্যান করবে।

২৫। জপ ধ্যানে পরিণত হয়—ধ্যান সমাধিতে। গভীর ধ্যানেই দিব্য দর্শনাদি হয়।

২৬। গুরুমুখ-নিঃসৃত হলেই মন্ত্র শক্তিসম্পন্ন ও চৈতন্যযুক্ত হয়।

২৭। শ্রীগুরু রয়েছেন হৃদয়ে। তাঁকে আর কোথাও খুঁজতে হবে না।

২৮। মায়ের আশীর্বাদে অনেক কল্যাণ হয়। গর্ভধারিণী খুশী থাকলে ঠাকুরও শীঘ্রই কৃপা করেন।

২৯। 'ধ্যান করবে মনে, বনে, কোণে।' এখানে বন মানে মন। মনেতে যে সব ভীষণ রিপু রয়েছে, এরাই জঙ্গল। আর মনে মানে হৃদয়ে। রিপু যত বলবান মনে হয়, ওরা তত নয়।

৩০। চাঁদের আলো ভোগীর জন্যে, আর অন্ধকার যোগীর জন্যে।

৩১। দুনিয়া আমাদের ভুলিয়ে রেখেছে, তাই তাঁকে রাত্রিতে ডাকা।

৩২। সহস্রারে যে দিব্যজ্যোতি বিরাজমান, তাই-ই নিম্নলোকে নেমে রূপ ধারণ করেন। ভক্ত রূপদর্শন ইচ্ছা করলে হৃদয়ে—অনাহত চক্রে বা ভ্রূমধ্যে—আজ্ঞাচক্রে তা দৃষ্টিগোচর হয়।

৩৩। পৃথিবীটাকে যদি গল্প মনে করে নেওয়া যায় তাহলে কত আনন্দ! আর যেই এটাকে সত্য মনে করলে, অমনি কষ্ট।

৩৪। তোমার আত্মাই তোমার পরম বন্ধু।

৩৫। নারায়ণের শঙ্খ মানে Creative power—আদি বাণী ওঁকার। চক্র—Law of evolution. গদা—Controlling power. পদ্ম—Creation.

৩৬। হৃদয়ের বৃত্তি হচ্ছে প্রেম, ভালবাসা ; আর মস্তিষ্কের কাজ হচ্ছে সদসৎ বিচার। এই প্রেম ও বিচার এক করতে হবে। ভগবানলাভের জন্যে দু'টিই চাই।

৩৭। যে মন যত শুদ্ধ, সে অন্যের চিন্তাধারা তত ভাল ধরতে পারে।

৩৮। যার নৈতিক চরিত্র নষ্ট হয়েছে, সে যথার্থই মৃত। এ মৃত্যুর তুলনায় দেহের মৃত্যু কিছুই নয়। যে নৈতিক চরিত্র-ভ্রষ্ট, তার এ কর্মফল জন্মজন্মান্তরে সঙ্গে যাবে।

৩৯। যথার্থ ছেলেপুলে হল মহৎ শুদ্ধ ও উদার চিন্তারাশি আর শুভ কর্ম। ঠাকুর মাকে বলেন, "তোমার লক্ষ লক্ষ ছেলে।" অর্থাৎ ঠাকুরের যে সব অমর ভাবরাশি, তার বিকাশ লক্ষ লক্ষ লোকের ভেতর দিয়ে হবে। সেই পবিত্র ভাবরাশিই প্রকৃত সন্তান।

৪০। রথযাত্রা—এ দেহরূপ রথে যে ভগবানকে বসিয়ে আনন্দ করে, সেই রথযাত্রার আনন্দ পায়।

৪১। স্নানযাত্রা—উচ্চ ও পবিত্র চিন্তায় অবগাহন করা।

৪২। খুব বিশ্বাস চাই, ধৈর্য চাই, ভরসা চাই।

৪৩। মনের দ্বারাই মনকে শাসন করবে। তুমিই তোমার মনের সম্পূর্ণ প্রভু।

৪৪। স্বোপার্জিত ধনের কিছু অংশ জগতের হিতের জন্য দেওয়া সকলের অবশ্য কর্তব্য।

৪৫। তাঁকে শুধু ধরে থাকবে—ভয় কিছুই নেই। মনটা ভয়ানক পাজী। যতক্ষণ না একটা কঠোর আঘাত লাগে ততক্ষণ ভগবানকে ঠিক ঠিক ডাকে না। ঘা খেলে তখন ঠিক ভগবন্মুখী হয়।

৪৬। সত্য পথে থাকবে, আর কারো অনিষ্ট করবে না, তা হলেই ভগবান কোলে টেনে নেবেন।

৪৭। মহাপুরুষদের বাক্য শ্রদ্ধাসহকারে বিশ্বাস করবে।

৪৮। ভগবান হলেন সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ। তাঁর রূপ অনন্ত—নাম বহু। যে যেমন ভক্ত—ভাব অনুযায়ী তার মনে সেই প্রকারের প্রতিবিম্ব পড়ে।

৪৯। কর্মী হতে গেলে খাঁটী ও সৎ হওয়া চাই। অপরের দোষ দেখবে না, বরং নিজের দোষের দিকে দৃষ্টি রাখবে।

৫০। অধ্যবসায় না থাকলে কোন বড় কাজ হয় না। ভগবানলাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য। এত বড় কাজ কি সহজে হয়? অলসতা আর কপটতা মোটেই প্রশ্রয় দেবে না। হয়তো পারের কাছে এসে পড়েছ, কিন্তু তখনও যদি সাঁতার না দাও—তোমাকে আবার স্রোতে টেনে নিয়ে যাবে আর নদীর গর্ভে ডুবিয়ে দেবে। নিজের সাধ্যমত অন্তরের সহিত চেষ্টা করলে ভগবান দশগুণ শতগুণ অনন্তগুণ অধিক শক্তি দেবেন—তখন ডাঙ্গা পেয়ে যাবে।

স্বামী অখণ্ডানন্দজীর কথা

১। মাকে দর্শন করা আর ঠাকুরকে দর্শন করা এক কথা।

২। যারা ভগবানকে যথার্থ ডাকে, তাদের চেহারা, চালচলনই আলাদা হয়। তাদের দেখলে আনন্দ হয়। তাদের মুখ সর্বদা প্রফুল্ল থাকে, হৃদয় পবিত্র থাকে, মন রাগদ্বেষশূন্য হয়; তারা সর্বদা সচ্চিদানন্দ-সাগরে ডুবে থাকতে চায়। তারা ভালমন্দ এক দেখে। ভালও তাদের কাছে ভাল, মন্দও তাদের কাছে ভাল।

৩। ঠাকুর শনি মঙ্গল বারে ধ্যানজপ বেশী করে করতে বলতেন। বলতেন, 'শনিবার মধুবার।'

৪। কেদার সর্বাংশে পরমধাম, কৈলাসেরই অনুরূপ। এক কৈলাস ভিন্ন হিমালয়ের আর কোন স্থানের সহিতই এর তুলনা হয় না।

৫। যে দেবদেবীর পূজাই কর না কেন, ঠাকুরকে সেই দেব বা দেবী বলে ভাববে ও সেই দেব বা দেবীর যে রকম পূজাবিধি, সেই বিধি অনুসারে ঠাকুরকে পূজা করবে।

৬। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ প্রকৃতপক্ষে একই আত্মা, যেন যুগ্ম-ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। স্বামীজী যেন শ্রীরামকৃষ্ণরূপ বেদান্তসূত্রের ভাষ্য।

স্বামী সুবোধানন্দজীর কথা

১। শ্রীশ্রীঠাকুরের তোমরা আশ্রিত সন্তান, তোমাদের আবার ভয় কি?

২। মনে রেখ, ঠাকুরের সংসার, তাঁর কাজ। তিনি

যেমন চালান, তেমনি চলবে। যখন যে অবস্থায় তিনি রাখুন না কেন, তাঁকে ভুলো না।

৩। খুব বিশ্বাস রাখ—তিনি আমার, আমি তাঁর। তাঁকে খুব আপনার জানবে, শত আপদ-বিপদ কিছুই করতে পারবে না।

৪। মঙ্গলময় ঠাকুর ও আমি তোমার ভেতরে বাইরে সব সময় আছি।

৫। ভগবানের রাস্তায় যে চলে, শান্তি তার নিকট হয় ও অশান্তি দূরে যায়।

৬। যেমন সূর্যের আলোতে সূর্য দেখা, সেই রকম তাঁর কৃপাতেই তাঁকে দেখা।

৭। তাঁর কৃপাতেই তাঁকে জানবার ইচ্ছা ও জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, বিশ্বাস—এই সব আসে।

৮। ধর্ম ঠাকুর ও মার সম্বন্ধে বই নিজে পড়বে ও পাঁচজনকে শোনাবে।

৯। সংসারে কিছুমাত্র ভয় থাবে না। এ সংসার সুখ-দুঃখ-জড়িত পরীক্ষার স্থল। অশান্তি মনে স্থান দেবে না। হৃদয়ে তিনি আছেন, বুক খালি হবে কেন? খুব বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁকে স্মরণ করবে। এখন রামের বনবাস, আবার রাম অযোধ্যায় আসবেন। বিশ্বাসী ভক্তের হৃদয়, তার কি কোন রকমে মন টলে?

স্বামী অদ্বৈতানন্দজীর কথা

১। প্রভু আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তিনিই সকলের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছেন; অতএব কা'কেই বা দোষ দেই, আর কারই বা সমালোচনা করি?

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজীর কথা

১। ঠাকুর ছাড়া পথ নেই। তিনি বল,বুদ্ধি,ভরসা—সবই। তাঁকে কোনমতেই ছাড়বে না। খুঁটি ছাড়লেই পড়ে যাবে।

২। জীবনের শেষ পর্যন্ত মাকে ডাকতে ডাকতে যদি একটা ডাকও ডাকার মত হয়ে পড়ে, তা হলেই তো কেল্লা ফতে!

৩। মায়া দিয়ে ঈশ্বর পালন করছেন।

৪। ঢেউ দেখে, সংসারে হাজার তুফান উঠলেও বা মনে হাজার দুর্বলতা এলেও কখনো হাল ছাড়বে না। কখনো মাকে ডাকতে ভুলবে না; তা তোতাপাখীর মত মুখের বাহ্যিক ডাকাই হোক, আর সরল ভক্তের মত আন্তরিক ডাকাই হোক।

৫। Live like a hermit, but work like a horse.

স্বামী যোগানন্দজীর কথা

১। তখন ঠাকুরের কথা কি কিছু বুঝতে পারতাম? এখন কিছু কিছু বুঝতে পারা যাচ্ছে। কত গভীর, কত সূক্ষ্ম ছিল তাঁর কাজ, তাঁর কথা! কি অদ্ভুত ছিল তাঁর দূরদৃষ্টি! তাঁর কোন ব্যবহারই নিরর্থক নয়।

২। স্বামীজী সম্বন্ধে তিনি যে বলেছিলেন, কেশবের চেয়ে ১৮ গুণ শক্তি, তখন আমাদের মধ্যে ক'জন তা ঠিক ঠিক বিশ্বাস করেছিল? এখন দেখ, স্বামীজীর ভিতর কি অদ্ভুত শক্তির বিকাশ! আজ ঠাকুরের শক্তি নরেনের ভেতর খেলছে।

২। নানা ধর্মমত, শাস্ত্ররাশি, তীর্থাদি থাকা সত্ত্বেও কাল-প্রভাবে ঐ সবের আদর্শ নষ্ট হয়ে যায় বলে শ্রীভগবান ধর্মের গূঢ় রহস্য বোঝানোর জন্যে, আদর্শ দেখানোর জন্যে হন অবতীর্ণ।

৪। শরৎ (স্বামী সারদানন্দ), তোকে একটা কথা বলে দিচ্ছি, তুই মাকে ধর, মা (শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী) যা বলবেন, তাই ঠিক।

স্বামী নিরঞ্জনানন্দজীর কথা

১। মাতাঠাকুরাণী আর ঠাকুর কি আলাদা? এক—অভেদ।

২। যোগেন (স্বামী যোগানন্দ) আমাদের মাথার মণি।

স্বামী বিবেকানন্দজীর কথা

১। রামকৃষ্ণ অবতার ও গুরু

১। বুদ্ধের হৃদয় ও শঙ্করের জ্ঞানের একত্র সমাবেশ মানব-জীবনের চরম স্ফূর্তি; আর জগৎবরেণ্য লোক-শিক্ষকগণের মধ্যে এক শ্রীরামকৃষ্ণই এই অপরূপ সমাবেশ-মূর্তি পরিগ্রহ করেছেন। তাঁর বাণী সত্যদ্রষ্টার বাণী, তাঁর একটি কথা আমার কাছে বেদ বেদান্ত অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ঈশ্বরাবতার, এতে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নেই। এ দেশের শত শত নরনারী প্রভুকে সকল অবতারের শ্রেষ্ঠ বলে পূজা করতে আরম্ভ করেছে। তাঁর জীবনকালেই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্নসমূহ ঈশ্বরাবতার বলে তাঁকে পূজা করেছে। ভারতীয় সকল মহাপুরুষের পূর্ণপ্রকাশস্বরূপ যুগাচার্য মহাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণকে আজ ইউরোপ-আমেরিকা সত্যসত্যই ফুলচন্দন দিয়ে পূজা করেছে। তিনি ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে

যে সামঞ্জস্য রয়েছে তা কার্যে পরিণত করে নিজ জীবনে দেখিয়ে গেছেন। তাঁর জীবনালোকে আমি দেখছি যে, দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদীর পরস্পর বিলয় করবার প্রয়োজন নেই। শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রচার কর। তাঁর উপদেশ, বিশেষত তাঁর নিষ্কলঙ্ক জীবনী প্রচার কর। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার ফলেই আমি প্রথম উপনিষৎ ও অন্যান্য শাস্ত্র কেবল অন্ধভাবে ভাষ্যকারের অনুসরণ না করে স্বাধীনভাবে উৎকৃষ্টতর রূপে বুঝতে শিখেছি। যে শক্তি আমার পশ্চাতে কার্য করছে, তা বিবেকানন্দ নয়, সে প্রভু স্বয়ং। তিনি আমার সঙ্গে সর্বদা রয়েছেন, সদাই আমাকে রক্ষা করছেন। আমার বোধ হয় শতকরা ৯৮ জনের মত এই যে—হয় অদ্বৈতবাদ সত্য, নয় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সত্য—নতুবা দ্বৈতবাদ সত্য। এইসব বিভিন্ন মত নিয়ে রীতিমত যুদ্ধ চলছে। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে এমন একজনের আবির্ভাব হল, যিনি নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সামঞ্জস্য রয়েছে, তা কার্যে পরিণত করে নিজ জীবনে দেখিয়েছেন।

২। তাঁর মুখ সাধারণ মানুষের মত ছিল না। উহাতে বালকবৎ কমনীয়তা, গভীর নম্রতা ও অদ্ভুত প্রশান্ত ও মধুর ভাব প্রকাশ পেত। কেউই তাঁর মুখ দেখে বিচলিত না হয়ে থাকতে পারত না। শ্রীশ্রীঠাকুর ঘোর দ্বৈতবাদী ও ঘোর অদ্বৈতবাদী। পরম ভক্ত ও পরম জ্ঞানী। শঙ্কর ও চৈতন্যের একত্র সমাবেশ।

এবারে মা মাতৃভাব। তিনি মেয়ে সেজে থাকতেন, তিনি যেন আমাদের মা। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের আনন্দময়ী মা পরমহংসদেবের দেহযন্ত্রের মধ্য দিয়ে ক্রীড়া করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেই জগন্মাতা ভিন্ন আর কেউই নন। তিনি জগতের ভাবরাজ্যে এক মহা ওলটপালট এনে দিয়েছেন। তাঁর দিব্য শ্রীচরণ স্পর্শ-করা শিষ্যগণ সারা ভারতে তাঁর বাণী প্রচার করেছেন। তিনি তাঁর ত্যাগী সন্তানদের মধ্যে বিরাজ করছেন। তাঁর ভেতর মানুষভাবটা মরে গিয়েছিল, কেবল ঈশ্বরত্বই অবশিষ্ট ছিল।

৩। শ্রীরামকৃষ্ণ বাইরে ভক্তিময় হলেও ভেতরে প্রকৃত জ্ঞানময় ছিলেন। তিনি আমার গুরুদেব, আমার আচার্য, আমার জীবনের আদর্শ, আমার ইষ্ট। তিনি আমার প্রাণের দেবতা। তাঁকে বাদ দিলে আমি কতকগুলো অর্থহীন ও স্বার্থময় ভাবুকতার বোঝামাত্র।

৪। তিনি ছিলেন জীবন্ত মানবদেহে উপনিষদের বাণী। বেদ-বেদান্ত আর সব অবতার, যা কিছু করে গেছেন, তিনি একলা নিজের জীবনে তা করে দেখিয়ে গেছেন। তাঁর জীবন না বুঝলে বেদ-বেদান্ত, অবতার প্রভৃতি বোঝা যায় না। যারা প্রভু রামকৃষ্ণের আশ্রিত, তাদের কোন ভয় নেই।

৫। যে ব্যক্তির আত্মা হতে অপর আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাঁকে গুরু বলে।

৬। যিনি তোমার ভূত-ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন, তিনিই তোমার গুরু। যিনি এই সংসার-মায়ার পারে নিয়ে যান, যিনি কৃপা করে মানসিক আধিব্যাধি বিনষ্ট করেন, যিনি অধীত বেদবেদান্ত, ব্রহ্মজ্ঞ ও অপরকে অভয়ের পারে নিয়ে যেতে সমর্থ, তিনিই যথার্থ গুরু।

৭। প্রকৃত গুরু তিনি, যিনি আমাদের আধ্যাত্মিক পূর্বপুরুষ, আমরা যাঁর আধ্যাত্মিকতার উত্তরাধিকারী।

৮। আচার্য প্রকৃতই শিষ্যগণের ভেতর আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চার করেন। একেই গুরুপরম্পরাগত শক্তি বলে। এ-ই যথার্থ Baptism—দীক্ষা, অনাদি কাল থেকে জগতে চলে আসছে।

৯। গুরুভক্তিই সকল প্রকার আধ্যাত্মিকতার মূল। গুরু ব্যতীত কোন জ্ঞান হতে পারে না।

১০। গুরুর প্রতি একান্ত আজ্ঞাবহতাই সকল সিদ্ধির মূল। যতদিন তোমাদের গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা থাকবে, ততদিন কেউ তোমাদের বাধা দিতে পারবে না।

১১। এক অনন্ত জ্ঞানসম্পন্ন গুরু, যাঁর আদি নেই, অন্তও নেই, তাঁকেই ঈশ্বর বলে।

১২। এমন কোন মহাত্মার শরণাগত হও, যাঁর নিজের বন্ধন ছুটে গেছে। কালে তিনিই কৃপাবশে তোমায় মুক্ত করে দেবেন।

১৩। নির্গুণ ব্রহ্মের বিকাশ যে খৃষ্ট, তিনি আমাদের জ্ঞেয়, কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মকে আমরা জানতে পারি না। আমরা পরম পিতাকে (God the Father) জানতে পারিনে, কিন্তু তাঁর তনয়কে (God the Son) জানতে পারি। নির্গুণ ব্রহ্মকে আমরা শুধু মানবস্বরূপ রঙের মধ্য দিয়ে দেখতে পারি, খৃষ্টের মধ্য দিয়ে দেখতে পারি।

১৪। বুদ্ধ, যিশু, রামকৃষ্ণ প্রভৃতির মত অবতারেরা কটাক্ষে বা স্পর্শমাত্র অপরের মধ্যে ধর্মশক্তি সঞ্চার করতে পারেন।

অবতারদের রাতদিন মনে থাকে যে তাঁরা ঈশ্বর। তাঁরা বদ্ধ বলে ভান করেন, কিন্তু তাঁরা সদাই মুক্তস্বভাব।

১৫। কৃষ্ণাবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য গোপীপ্রেম শিক্ষা। গোপীপ্রেম এত বিশুদ্ধ যে সর্বত্যাগ না হলে উহা বুঝবার চেষ্টা করাই উচিত নয়।

১৬। জগৎ বুদ্ধদেবের মত এতবড় নির্ভীক নীতিতত্ত্বের প্রচারক আর দেখেনি। তিনি আমার ইষ্ট, আমার ঈশ্বর।

১৭। শ্রীচৈতন্য গোপীদের প্রেমোন্মত্ত ভাবের আদর্শ ছিলেন। তাঁর প্রেমের সীমা ছিল না। তিনি সকলকেই দয়া করতেন।

১৮। বেদে আমরা শুধু মৎস্য-অবতারের কথা দেখতে পাই।

১৯। অবতারদের প্রকৃত তাৎপর্য মানুষপূজা।

২। মায়া ও শক্তি

১। প্রথমে শ্রীশ্রীমা ও তাঁর কন্যাগণ, তারপর পিতা ও তাঁর পুত্রগণ। আমার নিকট শ্রীশ্রীমার কৃপা বাবার কৃপা অপেক্ষা লক্ষগুণে অধিকতর মূল্যবান। শ্রীশ্রীমার কৃপাই আমার প্রধান সম্বল। আমেরিকা যাত্রার পূর্বে আমাকে আশীর্বাদ করবার জন্যে আমি শ্রীশ্রীমাকে লিখেছিলাম। তাঁর আশীর্বাদ এল, এবং একলম্ফে সমুদ্র পার হলাম। শ্রীশ্রীমার জীবনের অদ্ভুত রহস্য তোমরা কেউ-ই এখনো বুঝতে পারনি। শক্তির কৃপা ভিন্ন কিছুই যে হবার নয়!

২। শ্রীশ্রীমার ওপরে শান্ত ভাব, ভেতরে ভয়ঙ্করী সংহার-

মূর্তি। তিনি দশমহাবিদ্যার অন্যতমা বগলাদেবীর অবতার। সরস্বতী মূর্তিতে বর্তমানে আবির্ভূতা। মা সাক্ষাৎ জগদম্বা।

৩। আমি মুক্ত, আমি মায়ের সন্তান। মা-ই সব কর্ম করেন, মায়েরই সব লীলা ; আমি কেন মতলব আঁটতে যাব ? মা-ই তো যন্ত্রী, আমরা তাঁর হাতের যন্ত্র ছাড়া আর কি ? মা-ই আমাদের একমাত্র পথপ্রদর্শক, আর যা কিছু ঘটছে বা ঘটবে, সে সবই তাঁর বিধানে। আমি মায়ের দাস, তোমরা মায়ের দাস, আমাদের কি নাশ আছে ? ভয় আছে ?

৪। যারা প্রকৃত মায়ের ভক্ত, তারা পাথরের মত শক্ত, সিংহের মত নির্ভীক। মাকে তোমার কথা শুনতে বাধ্য কর। তাঁর কাছে খোসামোদ কি ? জবরদস্তি। তিনি সব করতে পারেন।

৫। পিতা ও মাতা—এই দুটি শব্দ অত্যন্ত ভালবাসাসূচক। প্রকৃত ভাগবত ঈশ্বরকে প্রাণে প্রাণে ভালবাসেন বলেই তিনি তাঁকে পিতা বা মাতা না বলে থাকতে পারেন না। আমাদের পার্থিব জননীতে সেই জগন্মাতার এক কণা প্রকাশ রয়েছে।

৬। মা সাধু পাপী সকলের মধ্য দিয়েই আপনাকে অভিব্যক্ত করছেন। আলোক অশুচি বস্তুর ওপর পড়লেও অশুচি হয় না, আবার শুচি বস্তুর ওপর পড়লেও তার গুণ বাড়ে না। আলোক নিত্য শুদ্ধ, সদা অপরিণামী। সকল প্রাণীর পেছনেই সেই মা। জগতে যত শক্তির বিকাশ দেখা যায় সবই সেই মা। তিনিই প্রাণরূপিণী, তিনিই বুদ্ধিরূপিণী, তিনিই প্রেম-রূপিণী। তিনি সমগ্র জগতের ভেতর রয়েছেন, আবার জগৎ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তিনি স্বয়ংই জীবজগতাত্মক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

৭। সমুদ্র যখন স্থির থাকে, তখন তাকে ব্রহ্ম বলা যায়। আর সেই সমুদ্রে যখন তরঙ্গ ওঠে, তখন তাকেই আমরা শক্তি বা মা বলি। সেই শক্তি বা মহামায়াই দেশকালনিমিত্তস্বরূপা। একটি সগুণ, অপরটি নির্গুণ। প্রথমোক্তরূপে তিনি ঈশ্বর, জীব ও জগৎ; দ্বিতীয় রূপে তিনি অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। সেই নিরুপাধিক সত্তা থেকেই ঈশ্বর, জীব ও জগৎ—এই ত্রিত্বভাব এসেছে। এইটি বিশিষ্টাদ্বৈত ভাব। জগন্মাতা আদ্যাশক্তিই ব্রহ্মের প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ। সেই জগজ্জননী ভগবতীর এক কণা, এক বিন্দু হচ্ছেন কৃষ্ণ, আর এক কণা বুদ্ধ, আর এক কণা খৃষ্ট।

৮। প্রকৃতি আর কিছুই নয়, অবিদ্যা আবরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত ব্রহ্মমাত্র। যখন সেই নিরপেক্ষ ব্রহ্মসত্তাকে আমরা মায়াবরণের মধ্য দিয়ে দেখি, তখন তাঁকে আমরা প্রকৃতি বলি। পুরুষকে মুক্ত করাই প্রকৃতির প্রয়োজন।

৯। আদিতে শব্দমাত্র ছিল, সেই শব্দ ব্রহ্মের সঙ্গে বিদ্যমান ছিল, আর সেই শব্দই ব্রহ্ম। হিন্দুরা এই শব্দকে মায়া বা ব্রহ্মের ব্যক্তভাব বলে থাকেন, কারণ এটি ব্রহ্মেরই শক্তি। শব্দের দু'টি বিকাশ। একটি প্রকৃতি, ইহাই সাধারণ বিকাশ। আর এক বিশেষ বিকাশ হচ্ছে কৃষ্ণ, বুদ্ধ, ঈশা, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার পুরুষগণ।

১০। হরগৌরীর অর্ধনারীশ্বর মূর্তির ব্যাখ্যা এই যে, একটি সর্বত্যাগ বা সন্ন্যাসের ভাব, অপরটি বিশ্বব্যাপী প্রেমের ভাব। ঐ কোমলে কঠোর সম্মিলনই জগৎ-তত্ত্ব বুঝবার গূঢ় প্রণালী।

তাই মহাকাল শ্মশানেশ্বরের ভৈরব রুদ্র মূর্তির সহিত জগৎজননীর মধুর মাতৃমূর্তির মিলন।

১১। শাক্ত মানে, যিনি ঈশ্বরকে সমস্ত জগতে বিরাজিত মহাশক্তি বলে জানেন ও সমগ্র স্ত্রীজাতিতে সেই মহাশক্তির বিকাশ দেখেন।

১২। মায়া অনাদি ও অনন্ত। এমন সময় ছিল না, যখন সমগ্র জগতে সৃষ্টিশক্তি ক্রিয়াশীল ছিল না। প্রলয়ের সময় প্রকৃতি অব্যক্তভাব ধারণ করেন। সৃষ্টি অনাদি, সৃষ্টির আরম্ভ আছে বলা সম্পূর্ণ পাগলামি মাত্র। মায়ার অর্থ কিছু না নয়, মিথ্যাকে সত্য বলে গ্রহণ করা।

১৩। সব সময় 'দুর্গা, দুর্গা' বলবে। এই নাম তোমাকে সকল বিপদ হতে রক্ষা করবে।

৩। ঈশ্বর, ধর্ম ও জগৎ

১। ঈশ্বর প্রেমের অবতারস্বরূপ। তিনি সর্বব্যাপী, জগতের সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয়কর্তা—জগতের অন্যটি জগৎজননী। মূর্তিপূজা আমাদের শাস্ত্রে অধমাধম বলা হয়েছে, কিন্তু তাই বলে উহা অন্যায় কাজ নয়। যদি সেই মূর্তিপূজক ব্রাহ্মণের পদধূলি আমি না পেতাম, তবে আমি কোথায় থাকতাম!

২। কলিযুগে দানই ধর্ম, তার মধ্যে ধর্মদান শ্রেষ্ঠ দান। বিদ্যাদান তার নিম্নে, তারপর প্রাণদান। সর্ব নিকৃষ্ট দান অন্নদান। ধর্ম অনুরাগে, অনুষ্ঠানে নয়। প্রেমই ধর্ম। ধর্ম অর্থে ঈশ্বরকে সাক্ষাৎভাবে স্পর্শ করা। ধর্ম অর্থে প্রাণের অনুভব—

প্রাণে প্রাণে সত্য উপলব্ধি—আমি আত্মাস্বরূপ। ধর্ম আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সম্বন্ধ নিয়ে। অদ্বৈতবাদীরা সগুণ ঈশ্বরের উচ্চতর অবস্থাবিশেষে বিশ্বাসী—উহাকে সগুণ নির্গুণ বলা যেতে পারে। অদ্বৈতবাদ ধর্মের এবং চিন্তার শেষ কথা।

৩। আমরা সেই ধর্মের উপাসক, বৌদ্ধধর্ম যার বিদ্রোহী সন্তান এবং খ্রীষ্টধর্ম অতি নগণ্য অনুকরণ মাত্র। আর্যসমাজী ও ব্রাহ্মগণ অদ্বৈতবাদীর নির্গুণ ব্রহ্ম ও মূর্তিপূজকের প্রকৃত উদ্দেশ্য বোঝেন না।

৪। আস্তিক মাত্রেই স্বীকার করেন যে, এই পরিণামী জগতের পশ্চাতে একটি অপরিণামী বস্তু আছে। ধর্ম কখন বাহ্য ইন্দ্রিয়জ্ঞানের দ্বারা লাভ হতে পারে না। ত্যাগেই ধর্মের আরম্ভ, ত্যাগেই ওর শেষ। ত্যাগই ভারতের জাতীয় পতাকা।

৫। জগৎ ব্যক্ত ও অব্যক্ত রূপে সর্বদাই রয়েছে, সুতরাং সেই জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞেয় বস্তুর কোন কালে অভাব হয় না।

৬। মানুষের ভেতর ঈশ্বরসাক্ষাৎই প্রকৃত ঈশ্বরসাক্ষাৎ।

৭। দর্শন হচ্ছে ধর্মের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা। দর্শনবর্জিত ধর্ম কুসংস্কারে ও ধর্মবর্জিত দর্শন শুধু নাস্তিকতায় পরিণত হয়। ধর্মভাবকে বিচারবুদ্ধি দ্বারা নিয়মিত করা উচিত, নচেৎ ওটা ভাবুকতামাত্রে পরিণত হয়।

৮। ঈশ্বর ও শয়তান—দুটি দেবতা নেই। একই ঈশ্বর, যাঁকে ভাল মন্দ দুই-ই বলতে হবে। জগতে একটামাত্র শক্তিই রয়েছে, যা কখন ভাল, কখন মন্দভাবে অভিব্যক্ত হচ্ছে। ঈশ্বর ও শয়তান একই নদী—কেবল স্রোতটা বিপরীতগামী। খাসা

জগৎ, মজার জগৎ, সামাজিক উন্নতি—এসব কথার তাৎপর্য—সোনার পাথরের বাটির মত।

৯। যতদিন আমরা পঞ্চেন্দ্রিয়বদ্ধ, যতদিন স্থূল জগৎ দেখছি, ততদিন সগুণ ঈশ্বর ও জীবাত্মা স্বীকার করতেই হবে, ততদিন আমরা দ্বৈতবাদী।

১০। ধর্মপথে অগ্রসর হওয়ার লক্ষণ : (১) সন্তোষলাভ, (২) মুখশ্রীর পরিবর্তন, (৩) মুখের শুষ্কতা ও কঠোরতাব্যঞ্জক রেখাগুলোর লয়, (৪) মনের শান্তি মুখে ফুটে ওঠা।

৪। জ্ঞান ও ভক্তি

১। অস্তিত্ব, জ্ঞান ও আনন্দ আত্মার ধর্ম নয়, আত্মার স্বরূপ। ধ্যান ব্যতীত জ্ঞান অসম্ভব। অনির্বচনীয় নির্গুণ সত্তার সঙ্গে আমাদের অভেদ জ্ঞানই মুক্তি। প্রেম, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ একই।

২। মুখ্যা-ভক্তি ও মুখ্যজ্ঞানে কোন প্রভেদ নেই। মুখ্যা-ভক্তি মানে হচ্ছে ভগবানকে প্রেমস্বরূপ উপলব্ধি করা। মুখ্য-জ্ঞান মানে হচ্ছে সর্বত্র একত্বানুভূতি, আত্মস্বরূপের সর্বত্র দর্শন। যা চিৎ অর্থাৎ চৈতন্য বা জ্ঞান, তাই আনন্দ বা প্রেম। সর্বভূতে প্রেমের দ্বারা জ্ঞানলাভ হয়। আত্মাই সকলের প্রেমাস্পদ। ভালবাসাই একমাত্র উপাসনা।

৩। জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তিলাভ অপেক্ষাকৃত সহজ। পরমেশ্বরে দৃঢ়ভক্তি হলে কেবল উহার দ্বারাই চিত্ত শুদ্ধ হয়ে থাকে। বাহ্যপূজা মানসপূজার বহিরঙ্গমাত্র। মানসপূজা ও চিত্তশুদ্ধিই আসল জিনিস। জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে যিনি একটির পক্ষপাতী হয়ে অপরটির নিন্দা করেন, তিনি জ্ঞানীও নন, ভক্তও নন।

৪। ভক্তি দ্বারা বিনা আয়াসে জ্ঞানলাভ হয়, ঐ জ্ঞানের পর পরাভক্তি আসে। পরাভক্তি লাভ হলে আত্মা দেহ হতে পৃথক হয়ে থাকে। জ্ঞান অর্থে বহুত্বের মধ্যে একত্বের আবিষ্কার। সকল জ্ঞানের চরম লক্ষ্যস্বরূপ পূর্ণ একত্বের বেশী অগ্রসর হওয়া যায় না।

৫। যখন মানুষ সর্ববস্তুতে ঈশ্বর ও ঈশ্বরে সমুদয় দর্শন করে, তখনই সে পূর্ণ ভক্তি লাভ করে।

৬। জ্ঞান জিনিসটা আপেক্ষিক মাত্র। আমরা ঈশ্বর হতে পারি, কিন্তু তাঁকে কখন জানতে পারিনে। পুনর্জন্মবাদ ব্যতীত জ্ঞান অসম্ভব। পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার ব্যতীত নতুন কোন জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। স্বপ্রকাশ জ্ঞান কখন জড়ের ধর্ম হতে পারে না। জ্ঞানই সকল জড়কে প্রকাশ করে।

৭। যখন আমরা ভগবানকে ভালবাসি, তখন যেন আমরা নিজেকে দু'ভাগ করে ফেলি—আমিই আমার অন্তরাত্মাকে ভালবাসি। পূর্ণভক্তির উদয়ে প্রকৃত জ্ঞান অযাচিত হলেও আসবেই আসবে। পূর্ণজ্ঞানের সঙ্গে প্রকৃতভক্তি অভেদ।

৮। প্রেমের প্রভাবে অচেতন জড়বস্তু চেতনে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এই হল বেদান্তের সারকথা। একত্বই প্রেমের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি।

৫। কর্ম

১। যাবৎ জ্ঞান না হয়, তাবৎ কর্ম।

২। মীমাংসাশাস্ত্রোক্ত ফলপ্রসূ কর্মবাদের নিবারণকল্পে গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মযোগের অবতারণা করা হয়েছে।

৩। কর্মমাত্রই ভ্রমাত্মক। শুদ্ধজ্ঞানে কর্মের অনুপ্রবেশও নেই। একথা পারমার্থিক ভাবে যথার্থ হলেও ব্যবহারকল্পে কর্মের বিশেষ উপযোগিত্ব আছে। জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়কে আচার্য শঙ্কর বহুধা খণ্ডন করলেও জ্ঞানবিকাশকল্পে কর্মকে আপেক্ষিক সহায়কারী এবং সত্ত্বশুদ্ধির উপায় বলে নির্দেশ করেছেন।

৪। অসীম বিশ্বাস ও ধৈর্যই কৃতকার্য হবার একমাত্র উপায়। সকল বড় কাজ মহাবিঘ্নের মধ্য দিয়ে হয়ে থাকে। বিশ্বাসই মানুষকে সিংহতুল্য বীর্যবান করে।

৫। চালাকি দ্বারা কোন মহৎ কাজ হয় না। প্রেম সত্যানুরাগ ও মহাবীর্যের সহায়তায় সকল কাজ সম্পন্ন হয়।

৬। তোমাদের জীবনে যাতে প্রবল ভাবপরায়ণতার সঙ্গে প্রবল কার্যকারিতা সংযুক্ত থাকে, তা করতে হবে।

৭। পরার্থে এতটুকু কাজ করলে ভেতরের শক্তি জেগে ওঠে। পরের জন্যে এতটুকু ভাবলে ক্রমে হৃদয়ে সিংহবলের সঞ্চার হয়। জগতের উপকার করতে আমরা প্রকৃতপক্ষে নিজেদের উপকারই করে থাকি।

৮। এ জগতে পূর্ণশক্তির কোন কর্ম থাকে না। তাকে কেবল অস্তি বা সৎ বলা হয়। আদর্শ পুরুষ তিনি, যিনি তীব্র কর্মতৎপরতার মধ্যে মরুভূমির নিস্তব্ধতা ও শান্তি এবং নিস্তব্ধতা ও নির্জনতার মধ্যে প্রবল কর্মতৎপরতাকে দেখতে পান।

৯। যজ্ঞাদি কর্ম প্রাচীনকালে উপযুক্ত ছিল, আধুনিক সময়ের জন্যে নয়। ভারতের সৌভাগ্যেই হোক বা দুর্ভাগ্যেই

হোক, বেদের কর্মকাণ্ড লোপ পেয়েছে। কুমারিলভট্টের উহার পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা নিষ্ফল হয়।

১০। কায়মনোবাক্যে জগদ্ধিতায় পেতে হবে। আমি বলি 'দরিদ্র দেবো ভব', 'মূর্খ দেবো ভব।'

১১। অত্যুৎকট পাপ বা অত্যুৎকট পুণ্য ইহজীবনেই তার ফল উৎপাদন করে।

১২। অদৃষ্ট তোমার নিজের হাতে। তোমার নিজের কর্মই তোমার এই শরীর গঠন করেছে। কৃত কর্মফল প্রসব না করে কোন মতেই বিনষ্ট হতে পারে না।

১৩। আমি যে কষ্ট ভোগ করছি, তা আমারই কৃতকর্মের ফল। উহা স্বীকার করলে সেই সঙ্গে ইহাও প্রমাণ হয় যে, উহা আবার আমার দ্বারাই নষ্ট হতে পারে।

১৪। জগতের বৈষম্যের সৃষ্টিকর্তা আমরাই। আমাদের পূর্বজন্মের কর্মের দ্বারা এই ভেদ---এই বৈষম্য হয়েছে। আমরা আমাদের নিজ নিজ অদৃষ্টের গঠনকর্তা। এই মত দ্বারা ঈশ্বরের বৈষম্য ও নৈঘৃণ্যদোষ নিরাকৃত হয়। আমরা যা ভোগ করি, তার জন্যে আমরাই দায়ী। এই মত দ্বারা অদৃষ্টবাদ খণ্ডিত হয়।

১৫। আধ্যাত্মিক আলোকই জগৎকে ভারতের দান। সমস্ত জগৎ আধ্যাত্মিক খাদ্যের জন্যে ভারতের দিকে তাকিয়ে আছে ও ভারতকে উহা জোগাতে হবে। বৌদ্ধদের জন্মেরও আগে ভারতীয় চিন্তা সমগ্র জগতে প্রবেশ করেছিল। বৌদ্ধ-ধর্মের অভ্যুদয়ের আগেই বেদান্ত চীন, পারস্য ও পূর্ব দ্বীপপুঞ্জে প্রবেশ করেছিল। ওঠ ভারত, তোমার আধ্যাত্মিকতা দ্বারা

জগৎ জয় করে ফেল। হিন্দুজাতি সমগ্র জগৎ জয় করবে। আধ্যাত্মিক চিন্তা দ্বারা জগৎবিজয় বলতে আমি জীবনপ্রদ তত্ত্বসমূহের প্রচারকেই লক্ষ্য করছি।

১৬। ইউরোপের কাছে ভারতের শিখতে হবে বহিঃপ্রকৃতি জয়, আর ভারতের কাছে ইউরোপের শিখতে হবে অন্তঃপ্রকৃতি জয়। তাহলে আর হিন্দু-ইউরোপীয় বলে কিছু থাকবে না; উভয়-প্রকৃতিজয়ী এক আদর্শ মনুষ্যসমাজ গঠিত হবে। এই দু'টির মিলনই দরকার। আমাদের ভুললে চলবে না যে আমাদেরও জগৎকে কিছু শিক্ষা দেবার আছে। যে কোন জাতিই হোক, তাকে বাঁচতে হলে তাকে কিছু দিতেই হবে।

১৭। আমাদের দেশের আহাম্মকদের বলো, আধ্যাত্মিক বিষয়ে আমরা জগতের শিক্ষক, ফিরিঙ্গীরা নয়। ইহলোকের বিষয় অবশ্য তাদের নিকট হতে আমাদের শিখতে হবে।

১৮। মানব জাতির ইতিহাসে দেখি, বার বার এই প্রাচীন ভারতকে যেন বিধাতার বিধানে জগতকে ধর্মশিক্ষা দিতে হয়েছে। আমাদের ধর্ম কখনও রক্তপাত করে নি। উহা সর্বদাই আশীর্বাণী ও শান্তিবাক্য উচ্চারণ করেছে। যুদ্ধ দ্বারা আমরা কোন জাতিকে জয় করি নি, সেই শুভ কর্মফলে আমরা এখনো বেঁচে আছি।

১৯। উচ্চতম জাতি হতে নিম্নতম পারিয়া পর্যন্ত সকলকে আদর্শ ব্রাহ্মণ হতে হবে। ভারতীয় অন্যান্য সকলের নিকট ব্রাহ্মণই প্রথম ধর্মতত্ত্ব প্রকাশ করেন ও সকলের আগে জীবনের গূঢ়তম সমস্যাসমূহের রহস্য উপলব্ধি করবার জন্যে সর্বত্যাগ করেন।

২০। ব্রাহ্মণই আমাদের পূর্বপুরুষগণের আদর্শ ছিলেন। তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ, যিনি সাংসারিক কোন কর্ম করেন না। সাংসারিক কার্য অপর জাতির জন্য, ব্রাহ্মণের জন্য নয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—তিন বর্ণের বেদে ও সন্ন্যাসী হবার সমান অধিকার।

২১। এই সংসার চিরকালই ভাল ও মন্দের মিশ্রণ হয়ে থাকবে। এমন কার্য নেই যা একই সময়ে ভাল ও মন্দের ফল উৎপন্ন করে না। আমরা বলতে পারি নে যে, এই কার্যটি সম্পূর্ণ ভাল ও এই কার্যটি সম্পূর্ণ মন্দ।

৬। গীতা-বেদ-বেদান্ত

১। গীতা, গঙ্গা হিন্দুর হিন্দুয়ানী।

২। গীতার ন্যায় বেদের ভাষ্য আর কখনও হয়নি, হবেও না। ইহা বেদান্তের ভগবদ্বক্ত্র বিনিঃসৃত টীকা।

৩। যিনি স্বয়ং বেদের প্রকাশ, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা বেদের একমাত্র প্রামাণ্য টীকা চিরকালের মত কৃত হয়েছে। এর ওপর আর কোন টীকা টিপ্পনী চলতে পারে না।

৪। গীতাকে সর্বশেষ উপনিষৎ বলে ধরা যেতে পারে।

৫। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যা বলে গেছেন, তার মত মহান্ উপদেশ জগতে আর নেই। যিনি গীতা লিখেছেন, তাঁর মত আশ্চর্য মাথা মনুষ্যজাতি আর কখন দেখতে পাবে না।

৬। সকল সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ ব্যাসসূত্রের নীচেই জগদ্বিখ্যাত গীতাই প্রামাণ্য। নিত্য যথাসাধ্য গীতা পাঠ করবে।

৭। গীতার মধ্যে যে শিক্ষা সমুদয় মহাভারতের মধ্যেও সেই শিক্ষা দেখতে পাই। গীতাকার যোগ, জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে যে বিবাদ ছিল, তার সামঞ্জস্য করেছেন। গীতায় বেদান্ত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে উপদিষ্ট হয়েছে।

৮। গীতাপাঠ না করলে কৃষ্ণচরিত্র বোঝা যাবে না, কারণ তিনি তাঁর নিজ উপদেশের মূর্তিমান বিগ্রহস্বরূপ ছিলেন। শঙ্করাচার্য যেসব বড় বড় কাজ করেছেন, তার মধ্যে গীতাপ্রচার ও গীতার অতি সুন্দর একটি ভাষ্যরচনা অন্যতম।

৯। কৃষ্ণের মাহাত্ম্য এই যে বেদের প্রচারক যত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি বেদান্তের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যাতা।

১০। বর্তমান কালে চিন্তাজগৎ ধীরে ধীরে ভারতের ভাব গ্রহণ করছে। হিন্দুকে কিছুই ত্যাগ করতে হবে না, তাকে কারো দ্বারস্থ হতে হবে না। সকলে তার মতই অনুসরণ করছে। পাশ্চাত্ত্য নাস্তিক এখন গীতা ও ধম্মপদেই শান্তি পাচ্ছে।

১১। বেদ অনাদি ও অনন্ত, চিরকাল একরূপ। উহা ঈশ্বরের জ্ঞানরাশি, বেদজ্ঞানেব সার ভাগের নাম উপনিষৎ বা বেদান্ত।

১২। বেদে দ্বৈত ও অদ্বৈততার উভয় অংশই আছে। বেদ দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয়ই, কিন্তু ভাষ্যকাররা গোল বাধিয়েছেন। বেদের শতকরা নিরানব্বই ভাগ এক হয়ে গেছে।

১৩। ভারতে ব্যাসসূত্রকেই সকল সম্প্রদায়ই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ বলে স্বীকার করেন। বেদান্তের পর স্মৃতির প্রমাণ। স্মৃতি যুগে যুগে বিভিন্ন।

১৪। ভক্তি, প্রেম ও জ্ঞানের খনি উপনিষৎ সকলই আমাদের শাস্ত্র। জ্ঞানকাণ্ড উপনিষৎকেই শ্রুতিশির বলা হয়।

১৫। আমাদের শাস্ত্রের অনৈতিহাসিকত্বই উহার সত্যতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, কারণ উহা মনুষ্যপ্রণীত হয়। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ আধ্যাত্মিক আবিষ্কর্তা। আমাদের ধর্ম কতকগুলি তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।

১৬। পুরাণ পণ্ডিতদের জন্যে নয়, সাধারণ লোকদের জন্যে। পুরাণে ভক্তির চরম আদর্শ দেখতে পাওয়া যায়।

১৭। বেদান্তদর্শন প্রাচীনতর সাংখ্যদর্শনের চরম পরিণতি।

১৮। যে শব্দরাশিদ্বারা অব্যক্ত চিন্তারাশি ব্যক্ত হয়, তাই বেদ।

৭। সুখ-দুঃখ

১। মানুষ যে সুখের আশা করছে, সেটা আর কিছু নয়, সে যে সাম্যভাব হারিয়েছে, সেইটে পুনরায় পাবার চেষ্টা করছে। এই যে নীতিপালন, এও বদ্ধভাবাপন্ন ইচ্ছার মুক্ত হবার চেষ্টা। আর এ হতেই প্রমাণ হয় যে আমরা পূর্ণাবস্থা থেকে নেমে এসেছি।

২। যদি দুঃখবিপদ আসে, জেনো ঈশ্বর তোমার সঙ্গে খেলা করছেন, আর এইটি জেনে দুঃখের ভেতরও পরমসুখী হও। যে আত্মা যত উন্নত, তার সুখের পর দুঃখ তত শীঘ্র আসবে। আমরা চাই সুখ ও দুঃখের অতীত অবস্থায় যেতে। ঐ উভয়ের পশ্চাতে রয়েছেন আত্মা, তাঁ'তে সুখও নেই, দুঃখও নেই। সুখ-দুঃখ অবস্থাবিশেষ, আর অবস্থা মাত্রেই

সদাপরিবর্তনশীল। কিন্তু আত্মা অপরিণামী, শান্তিস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ।

৩। ধন্য তারা, যারা শীঘ্র শীঘ্র পাপের ফল ভোগ করে। তাদের হিসাব শীঘ্র শীঘ্র মিটে গেল। যাদের পাপের প্রতিফল দেরীতে আসে, তাদের মহাদুর্দৈব, তাদের বেশী ভুগতে হবে। এই জগৎ দুঃখের আগার বটে, কিন্তু ইহা মহাপুরুষগণের শিক্ষালয়স্বরূপ।

৪। ভোগ হচ্ছে লক্ষ-ফণা সাপ ; তাকে পদদলিত করতে হবে। ইন্দ্রিয়চরিতার্থতাই সুখ—এ ধারণা সম্পূর্ণ জড়বাদাত্মক। ওতে এক কণাও যথার্থ সুখ নেই। ওতে যা কিছু সুখ, তা সেই প্রকৃত আনন্দের প্রতিবিম্বমাত্র।

৫। দুঃখের মুকুট পরে সুখ এসে মানুষের কাছে দাঁড়ায়।

৬। ভাল মন্দ নিত্যসংযুক্ত, এক জিনিসেরই এপিঠ ও ওপিঠ। একটি নিলেই আরেকটি নিতে হবে। কিছু মন্দ নেই, সব ভাল, এরূপ জগতে বাসের কল্পনাকে ভারতীয় নৈয়ায়িকগণ আকাশকুসুম বলেন।

৭। ভাল, মন্দ দু'টি পৃথক বস্তু নয়, কিন্তু এক। পরস্পরের মধ্যে প্রকারগত কোন প্রভেদ নেই, প্রভেদ কেবল পরিমাণগত। সুখ-দুঃখ হাত ধরাধরি করে চলতেই ভালবাসে।

৮। যারা দুঃখ-কষ্ট না পেয়েছে, তারা তো কচি খোকা। দুঃখ-কষ্ট না পেলে কি মহৎ লোক হয়? একমাত্র দুঃখই জীবনের গভীরে প্রবেশ করবার অন্তর্দৃষ্টি এনে দেয়।

৯। প্রাচ্যগণের জন্ম হতে ধারণা—সংসার দুঃখপূর্ণ, উহা

কিছুই নয়। আর পাশ্চাত্ত্যগণ জগৎকে আনন্দপূর্ণ, সম্ভোগ করবার জিনিস বলে মনে করেন।

১০। এ সংসার মঙ্গল ও অমঙ্গল, সুখ ও দুঃখের মিশ্রণ। একটিকে বাড়ালে অপরটিও সঙ্গে সঙ্গে বাড়বে। আমাদের সুখী হবার ক্ষমতা যদি Arithmetical progression-এ (যোগ ঘড়ি) অগ্রসর হয়, অসুখী হবার ক্ষমতা Geometrical progression (গুণ ঘড়ি)-তে বাড়বে। বেদান্তদর্শন সুখ বা দুঃখ বা নিরাশাবাদী নয়, উহা উভয় বাদই প্রচার করছে। ইহা দারুণ দুঃখবাদ নিয়ে আরম্ভ হয় ও প্রকৃত সুখবাদে এর পরিসমাপ্তি।

৮। আহার

১। আহারসংযম ব্যতীত চিত্তসংযম অসম্ভব।

২। অতিভোজন থেকে অনেক অনর্থ হয়। ওতে শরীর ও মন দুই-ই জাহান্নমে যায়।

৩। খাদ্য তিন প্রকারে দুষ্ট হয়। জাতিদোষ—যেমন পেঁয়াজ, রসুনাদি; নিমিত্তদোষ—কীটপতঙ্গ ও ধূলিসংযুক্ত খাদ্য; আশ্রয়দোষ—অসৎ লোকস্পৃষ্ট খাদ্য।

৪। ব্রাহ্মণের সন্তান হলেও যদি সে ব্যক্তি লম্পট ও কুক্রিয়াসক্ত হয়, তবে তার হাতে খাওয়া উচিত নয়।

৫। যাঁর উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ধর্মজীবন, তার পক্ষে নিরামিষ, আর যাঁকে খেটেখুটে এই সংসারের দিবারাত্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে জীবনতরী চালাতে হবে, তাকে মাংস খেতে হবে বৈকি।

৬। যতদিন ক্ষাত্রশক্তির প্রাধান্য থাকবে, ততদিন মাংস-ভোজন প্রচলিত থাকবে। আমিষভোজন প্রথার অনাদর হওয়াতেই এদেশের লোকের শক্তিসামর্থ্য এত হীন ও জাতীয় অবনতি এত গুরুতর হয়েছে।

৭। পরের জন্য সর্বস্বপণ, কামিনী-কাঞ্চনে সম্পূর্ণ অনাসক্তি, নিরভিমানিত্ব, অহংবুদ্ধিশূন্যত্ব ইত্যাদি সত্ত্বগুণ-প্রকাশের লক্ষণ। এই সব লক্ষণ যার হয়, তার আর আমিষ-আহারের ইচ্ছা হয় না।

৮। মন সম্পূর্ণরূপে নিজের বশে এলে যা ইচ্ছা তাই আহার করা চলে।

৯। ভক্ত হতে গেলে মাংসাহার ত্যাগ করতে হবে, কারণ উহা উত্তেজক ও স্বভাবতই অপবিত্র। আমরা অপরের প্রাণ বিনাশ না করে মাংস পেতেও পারিনে।

১০। মাংস খাওয়া অবশ্য অসভ্যতা, নিরামিষ ভোজন অবশ্যই পবিত্রতর।

৯। বিবিধ

১। 'আমি অমুকের চেলা, কামকাঞ্চনজিৎ ঠাকুরের সঙ্গীর সঙ্গী এইরূপ অভিমান খুব রাখবি; এতে কল্যাণ হবে। এই অভিমান যার নেই, তার ভেতর ব্রহ্ম জাগেন না। ঘুমুবার সময়ও বিচারের তরোয়ালখানা শিয়রে রেখে ঘুমুবি, যেন স্বপ্নেও লোভ সামনে না এগুতে পারে।

২। বায়ুর ন্যায় মুক্ত ও অবাধগতি হও, অথচ লতা ও কুকুরের ন্যায় নম্র ও আজ্ঞাবহ হও। স্বাধীন চিন্তা যেমন

আবশ্যক, আজ্ঞাবহতাও তেমনি আবশ্যক। নিজের সম্প্রদায়ের উপর গভীর শ্রদ্ধা রাখতে হবে।

৩। দুর্বলতাই মৃত্যু, দুর্বলতাই পাপ।

৪। বিশ্বাসই ভেতরকার দৈবীশক্তিকে জাগ্রত করে। বিশ্বাসবলে মানুষ যা কিছু করতে পারে। প্রথমে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস কর, তারপর ভগবানে বিশ্বাস।

৫। মানুষের কাছ থেকে যত কম সাহায্য লওয়া যাবে, ভগবানের কাছ থেকে তত বেশী সাহায্য পাওয়া যাবে।

৬। সন্ন্যাসীর জীবন অন্তরপ্রকৃতির সঙ্গে একটা তুমুল সংগ্রাম। আত্মপ্রতিষ্ঠা নয়, আত্মোৎসর্গই বিশ্বের উচ্চতম বিধান।

৭। দোষ দেখা বড়ই সহজ, গুণ দেখাই মহাপুরুষের ধর্ম। সকলের ওপর সমান প্রীতি বড়ই কঠিন, কিন্তু তা না হলে মুক্তি হবে না।

৮। Education is the manifestation of the divinity which is already in man. Religion is the manifestation of the perfection which is already in man.

৯। কাশীপুরী ও কাশীনাথ দর্শনে যার মন বিচলিত না হয়, সে নিশ্চিত পাষাণে নির্মিত।

১০। হিমালয় পর্বত বৈরাগ্য ও ত্যাগের সাকার মূর্তিরূপে দণ্ডায়মান। যদি ভারতের ধর্মেতিহাস হতে হিমালয়কে বাদ দেওয়া যায়, তবে তার অল্পমাত্রই অবশিষ্ট থাকবে।

১১। কেবল বর্তমান কালই বর্তমান, আমরা চিন্তায় পর্যন্ত

অতীত ও ভবিষ্যতের ধারণা করতে পারিনে ; কারণ চিন্তা করতে গেলেই তাকে বর্তমান করে ফেলতে হয়।

১২। আমি চাই গোঁড়ার নিষ্ঠাটুকু ও তার সঙ্গে জড়বাদীর উদার ভাব। হৃদয় সমুদ্রবৎ গভীর ও আকাশবৎ প্রশস্ত হওয়া চাই।

১৩। বাসনাগুলো হচ্ছে সোনার পাতে মোড়া বিষের বড়ি। বাসনা জয় না করলে মুক্তি নেই।

১৪। আমি বরং তোমাদেরকে ঘোর নাস্তিক দেখতে ইচ্ছা করি, কিন্তু কুসংস্কারগ্রস্ত নির্বোধ দেখতে ইচ্ছা করি নে।

১৫। 'প্রকৃতির পরিবর্তন' কথাটি স্ববিরোধী ; কারণ যার পরিবর্তন হয়, তাকে আর প্রকৃতি বলা যায় না।

১৬। তিনিই যথার্থ হরিভক্ত, যিনি সেই হরিকে সর্বভূতে দেখেন।

১৭। মন্ত্র হচ্ছে ভাবশক্তিময়, ভাববিশেষব্যঞ্জক শব্দ।

১৮। সমাধি অর্থে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদভাব, সমত্বভাব।

১৯। When a man goes into *Samadhi*, if he goes into it a fool, he comes out a sage.

২০। সাধুগণ যেখানে বাস করেন, অথচ সেখানে যদি একটিও মন্দির না থাকে তো তাকেই তীর্থ বলে। যদি কোন স্থানে শত শত মন্দির থাকে, কিন্তু সেখানে অনেক অসাধু লোক বাস করে তো সে স্থানের তীর্থত্ব নষ্ট হয়ে যায়।